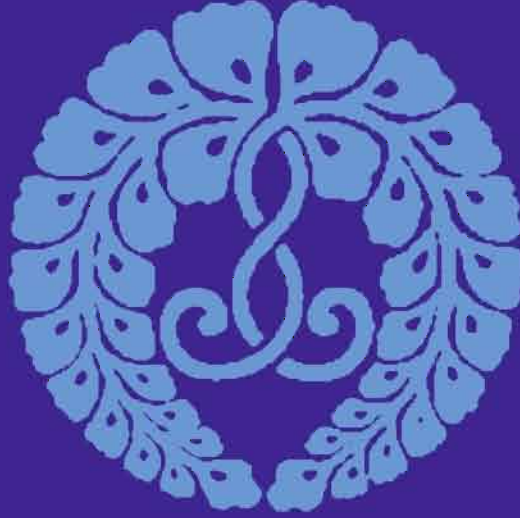


রচনা সম্ভার

ষষ্ঠ শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ
থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

রচনা সম্ভার

ষষ্ঠ শ্রেণী

রচনায়

শরফউদ্দিন আহমেদ
শামীম জাহান আহসান

সম্পাদনায়

ড. সরকার আবদুল মান্নান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৮

পুনর্মুদ্রণ :

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ :
মোঃ পারভেজ

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংযোগ ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এসবের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করেছিল ৬ষ্ঠ, ৭ম-৮ম ও ৯ম-১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা রচনা বই রচনা সম্ভার।

২০১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত গ্রন্থ তিনটিতে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তক তিনটিতে রচনাগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কার-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য ও নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে এবং এ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, নৈতিকতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের সুস্থ চিন্তার চর্চা করানোই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে প্রতিটি রচনাকে এক একটি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করাই হবে আমাদের কাম্য। এছাড়া গ্রন্থগুলোর বিরচন অংশে যে-সব বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন, বাক্য-সংকোচন, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, বিপরীতার্থক শব্দ, চিঠি-পত্র, অনুবাদ, ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে সেগুলোকেও মডেল হিসেবে গ্রহণ করাই হবে যৌক্তিক। এই সব উদাহরণ বা মডেল-এর ওপর ভিত্তি করে যেন শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার আলোকে প্রবন্ধ রচনা ও কম্পোজিশন তৈরি করতে পারে, সে দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সজ্জী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

রচনা সম্ভার শীর্ষক এই গ্রন্থটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ রচনা	০১
বাংলাদেশের ফল	০২
বাংলাদেশের ফুল	০৩
বাংলাদেশের খেলাধুলা	০৫
বাংলাদেশের জাতীয় পাখি	০৭
বাংলাদেশের জাতীয় পশু	০৮
মহাস্থানগড়	০৯
আমাদের গ্রাম	১০
লালবাগ দুর্গ	১২
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	১৩
আমাদের বিদ্যালয়	১৫
ধান	১৬
বাংলাদেশের ষড়ঋতু	১৭
বাংলাদেশের নদ-নদী	১৯
শখের কাজ	২১
অধ্যবসায়	২২
শিষ্টাচার	২৩
শ্রমের মর্যাদা	২৫
শৃঙ্খলাবোধ	২৮
সময়ানুবর্তিতা	৩০
সত্যবাদিতা	৩১
দেশপ্রেম	৩৩
বৈশাখী মেলা	৩৪
বনভোজন	৩৬
নদীপথে ভ্রমণ	৩৮
একজন কৃষকের আত্মকাহিনী	৪১
স্বাস্থ্যরক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	৪৩
পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪৪
বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুস	৪৬
বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন	৪৯
পত্র লিখন	৫৪
ভাবসম্প্রসারণ	৭৯

প্রবন্ধ রচনা

রচনা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল নির্মাণ করা। বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে নতুন কিছু গড়ে তোলাই রচনা। যে কোনো রচনাকে নির্মাণ কাজ বললেও স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনের জন্য যে রচনার কথা বলা হয় তা প্রবন্ধ রচনা নামে পরিচিত।

জন্মের পর থেকে মানবশিশু বাইরের জগৎ সম্পর্কে জানতে চায় এবং নিজের মনোভাব অন্যকে জানাতে চায়। ভাবের এই আদান-প্রদানের প্রধান উপকরণ মানুষের ভাষা। এ ভাষাকে অবলম্বন করে মানুষ অন্যের চিন্তাভাবনাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং নিজের চিন্তাভাবনা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা থেকেই রচনার উদ্ভব। এই রচনাকেই বলা হয় প্রবন্ধ রচনা।

প্রবন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। ইংরেজিতে বলে 'Essay', বাংলায় 'প্রবন্ধ'। Essay শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে প্রয়াস বা চেষ্টা। এ চেষ্টা বা প্রয়াসের মধ্যেই থাকে রচয়িতার দক্ষতা ও পটুত্ব। সুতরাং, নিজের মনের মাদুরী মিশিয়ে কোনো একটি বিষয় যুক্তি, তথ্য এবং উদাহরণের মাধ্যমে সুচারু এবং সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ করার নামই প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধ সাধারণত তিন প্রকারের। যথা— ক. বর্ণনামূলক খ. ঘটনামূলক গ. চিন্তামূলক বা ভাবমূলক।

ক. বর্ণনামূলক

কোনো বস্তু, স্থান, প্রাণী, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করে যে প্রবন্ধ রচিত হয় তাই বর্ণনামূলক রচনা। যেমন— ধান, ঢাকা, হাতি ইত্যাদি।

খ. ঘটনামূলক

কোনো বিখ্যাত লোকের জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, উৎসব, ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধই ঘটনামূলক প্রবন্ধ। যেমন— বৈশাখী মেলা, কারখানা, মহাস্থানগড়, ১৬ই ডিসেম্বর, হযরত মুহাম্মদ (সা) ইত্যাদি।

গ. চিন্তামূলক বা ভাবমূলক

লেখকের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা অবলম্বনে রচিত প্রবন্ধকে চিন্তা বা ভাবমূলক প্রবন্ধ বলে। যেমন— দেশপ্রেম, সত্যতা, মাতৃভাষা, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে রচনার বিষয়বস্তু যেন তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। রচনার বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখতে হবে। আংশিক বা পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। রচনার বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষা নির্বাচন করতে হবে। বক্তব্যে সরলতা ও স্পষ্টতা থাকতে হবে।

বাংলাদেশের ফল

ভূমিকা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ণ লীলাভূমি আমাদের এ বাংলাদেশ। এ দেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর বলে সামান্য পরিশ্রমেই এখানে নানারকম ফলমূল ফলানো যায়। বছরে ছয়টি ঋতু পালক্রমে প্রকৃতিকে আপন মনে সাজিয়ে তোলে। একই সঙ্গে উপহারও দেয় রূপ-রস-গন্ধে ভরা সুস্বাদু বিভিন্ন ফলের ভান্ডার।

বিভিন্ন ঋতু ও ফলের সমাহার

বাংলাদেশ মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। জলবায়ুর প্রভাবে এদেশে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব ঘটে এবং ঋতুর ওপর ভিত্তি করে মাটির গুণাগুণের জন্য একেক জেলায় একেক রকম ফল জন্মে থাকে। তাই বাংলাদেশে আমরা বিভিন্ন ঋতুতে দেখতে পাই বিভিন্ন ফলের সমারোহ। আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, কলা, তাল, নারিকেল, বেল কদবেল, কামরাঙা, বাতাবিলেবু, ডালিম, আমলকী, শরিফা, আতা, তরমুজ, বাজি ইত্যাদি আমাদের দেশীয় ফল।

গ্রীষ্মকালের ফল

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। এ ষড়ঋতুর পরিক্রমায় প্রথমেই আসে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সবাই। গরমের এই তাপদাহে শরীরের শুষ্কতাকে দূর করার জন্য প্রকৃতির কাছ থেকে পাই আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, বেল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল। সুস্বাদু ও রসাল ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এই মাসকে ‘মধুমাস’ বলা হয়।

বর্ষাকালের ফল

ঋতু পরিবর্তনের ধারায় গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষাকাল। চারদিক পানিতে থৈ থৈ করে। গ্রীষ্মকালের ফল কিছু পরিমাণে বর্ষার শুরুতে পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বর্ষার উপহার আনারস, আমড়া, পেয়ারা, কামরাঙা ইত্যাদি উপাদেয় ফল যা আমাদের রসনার তৃপ্তিসাধন করে।

শরৎ ও হেমন্তকালের ফল

বর্ষার পরই প্রকৃতিতে প্রকাশ পায় শান্তিসিদ্ধ মধুর শরৎ ও হেমন্ত ঋতু। এ ঋতুর প্রধান ফল তাল। এ ছাড়া পাওয়া যায় বাতাবিলেবু, আমলকী, ডালিম। নবান্নের উৎসবে সবার ঘরেই তৈরি হয় নারিকেলের নাড়ু, সন্দেশ ও তালের পিঠা। এদের মিষ্টি গন্ধে চারদিক ভরে ওঠে।

শীতকালের ফল

শীতকালে প্রচুর পরিমাণ ফল পাওয়া যায় না। এ সময় কমলা, বেদানা, কুল, জলপাই, সফেদা, কলা ও আখের প্রচুর সমাবেশ ঘটে।

রচনা সম্ভার

বসন্তকালের ফল

শীতের পরেই ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। গ্রীষ্মকালে যে ফলের প্রাচুর্য থাকে তার প্রস্তুতিপর্ব এই বসন্তকাল। তবে এ সময়কার ফলের মধ্যে ফুটি, তরমুজ, বাজিা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।


অঞ্চলভিত্তিক ফল

দেশের একেক অঞ্চলে একেক রকম ফল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে আম ও লিচু ভালো জন্মে। এদেশের প্রায় এলাকাতেই কাঁঠালগাছ আছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় প্রচুর কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। সিলেটে, মধুপুরগড়ে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচুর আনারস জন্মে। বরিশালে পাওয়া যায় পেয়ারা, আমড়া, তাল ও নারিকেল। সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে। বেলেমাটিতে ফুটি, তরমুজ, বাজিা ইত্যাদি জন্মে। অন্যান্য ফল দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে উন্নত চাষাবাদ প্রণালির ফলে বাংলাদেশে অধিক পরিমাণে ফল উৎপাদিত হচ্ছে।

ফলের গুরুত্ব

ফল বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য না হলেও মানুষের পুষ্টিসাধনের অনেকখানি দায়িত্ব পালন করে। প্রকৃতির নানারকম সুস্বাদু ফল আমাদের পুষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পেঁপে, নারিকেল, কলা প্রভৃতি ফল প্রায় সারা বছর পাওয়া যায়। পেঁপে খুবই উপাদেয় ফল। এটি রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ ধরনের ঔষধ তৈরির জন্য ফলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

উপসংহার

প্রকৃতির দান মৌসুমি ফল তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের মাটি ফল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। যত্ন করলে ফলের উৎপাদন বাড়বে এবং রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ব্যবস্থা হবে। তাই ফল উৎপাদনে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। 

বাংলাদেশের ফুল

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রকৃতির আদরের দুলালী। ফুল হচ্ছে প্রকৃতির সুন্দরতম উপহার। আর সুন্দরের সঙ্গে আনন্দের রয়েছে নিবিড় সম্বন্ধ। ফুলের সৌন্দর্য দেখলেই হৃদয় পবিত্র আনন্দে ভরে ওঠে। এ জন্য ফুলের আদর রয়েছে সব দেশে সবকালে। বছরের ছয়টি ঋতুতে রূপসী বাংলা বিভিন্ন ফুলে তার বরণডালা সাজিয়ে হাজির হয় আমাদের সামনে।

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফুল

ছয় ঋতুর পালাবদল হয় এ দেশে। বিভিন্ন ঋতুতে এখানে নানারকম ফুল অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। ফুলের মধ্যে গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলি, হাস্নাহেনা, বকুল, জুঁই, কামিনী, পদ্ম, কৃষ্ণচূড়া, কনকচাঁপা, কাঁঠালচাঁপা, চামেলি,

পলাশ ইত্যাদি। কত রং-বেরঙের ফুল ফোটে বাংলার বনে বনে। ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে কবি বলেছেন, “ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই।”

গ্রীষ্মকালীন ফুল

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে যখন মাঠ-ঘাট ও পথ-প্রান্তর শুকিয়ে যায়, প্রকৃতিতে যখন বিরাজ করে শুষ্কতা ও মলিনতা, তখন নানা রকম ফুল ফুটে আনন্দ বয়ে আনে। কৃষ্ণচূড়া, করবী, চাঁপা, গন্ধরাজ, বেলি, পলাশ, বকুল প্রভৃতি ফুলের সৌরভে মেতে ওঠে বাংলার প্রকৃতি।

বর্ষাকালীন ফুল

বর্ষায় নামে প্রবল বারিধারা। তার সঙ্গে কোনো সুদূর বন থেকে ভেসে আসে কদম-কেয়ার সৌরভ। পুকুর-ডোবা ও বিল-ঝিলের দিকে তাকালে দেখা যায় শাপলা, কুমুদ ও কচুরিপানা ফুলের শুভ্র হাসি। বর্ষার অধিকাংশ ফুলের রং সাদা। এ ছাড়া বর্ষাকালে আরও ফোটে জুঁই, কেয়া, কেতকী, কুন্দ, কামিনী, দোপাটি প্রভৃতি ফুল। এসব ফুলের অপূর্ব শোভা মনে পবিত্রতা আনে এবং মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

শরৎ ও হেমন্তকালীন ফুল

বর্ষা শেষ হলে আসে শান্ত-স্নিগ্ধ মধুর শরৎ ও হেমন্ত। আকাশে ভেসে বেড়ায় নীড়হারা সাদা মেঘ, মাঠে মাঠে জমে সবুজের মেলা, যেন সর্বত্র সজীবতা ও পরিচ্ছন্নতার ভাব। এ দুটি ঋতুর কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নদীর তীরে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা, আর শিশিরসিক্ত শেফালি ফুলের সমারোহ। পদ্ম, কামিনী, মল্লিকা ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাস মনকে দেয় আনন্দ আর নয়নকে দেয় তৃপ্তি।

শীতকালীন ফুল

শীতকে পাতা ঝরার ঋতু বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে এ শীতকালেই দেখা যায় অজস্র ফুলের সমারোহ। শীত ঋতুতে গোলাপ, সূর্যমুখী, গাঁদা, অতসী, রজনীগন্ধা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া প্রভৃতি রকমারি ফুল ফোটে। তবে রজনীগন্ধা সারা বছরই পাওয়া যায়। এ সময় আম, জাম প্রভৃতি গাছ মুকুলিত হয় ও মুকুলের গন্ধে মৌমাছি গুঞ্জন করে।

বসন্তকালীন ফুল

ঋতুরাজ বসন্ত যেন আসে রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে। বসন্ত যেন প্রকৃতির একটি উৎসব। এ ঋতুর জাদুময়ী স্পর্শে বৃক্ষ-লতাদি নব পুষ্পপল্লবে সুন্দর ও মধুর হয়ে ওঠে। শিমুল, অশোক, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ প্রভৃতি ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ সবার মনে রঙের পরশ বুলিয়ে দেয়। কোকিলের কুহুরবে ও ফুলের সুবাসে মনে-প্রাণে আনন্দের পরশ লাগে।

বন্যফুল

কতকগুলো নাম না জানা ফুল বনে বনে ফুটে বনেই ঝরে যায়। এদের রূপ-রস-গন্ধ বন্য কীটপতঙ্গ ও পশুপাখিকে মুগ্ধ করে, তাদের মজ্জা সাধন করে। যত্নসহকারে এ সকল ফুল উৎপাদন করা হয় না; কিন্তু সেগুলোর সৌন্দর্যে মানুষ ও কীটপতঙ্গ আনন্দ ও সুখ-সমৃদ্ধির সন্ধান পেতে পারে। মল্লুয়া, ধুতুরা, আকন্দ ইত্যাদি এই ধরনের ফুল।

রচনা সম্ভার


ফুলের গুরুত্ব

ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক, সেই সঙ্গে পবিত্রতারও প্রতীক। ফুল মনে প্রশান্তি আনে আর শান্তির পরিবেশ তৈরি করে। যে কোনো আনন্দের অনুষ্ঠানে, বিয়ের সাজসজ্জায়, গৃহসজ্জায়, পূজাপার্বণে ফুলের ব্যবহার আজকাল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফুলের অর্থনৈতিক মূল্যও কম নয়। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলের চাষ হচ্ছে। ফুলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি ফুল উপহার হিসেবে মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। তাই কবি বলেছেন :

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি

দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেক ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।

উপসংহার

ফুল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আধার। বাংলাদেশ চিরদিনই প্রকৃতির অকপণ দানে হয়েছে ধন্য। আখ্যায়িত হয়েছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বলে। অতএব, যে ফুল মানুষের চোখে রূপের পরশ বুলিয়ে দিয়ে আনন্দে হৃদয়-মন ভরিয়ে দেয়, সে ফুল চাষের দিকে নজর দেওয়া উচিত। 

বাংলাদেশের খেলাধুলা

ভূমিকা

জীবন কর্মময়। মানুষ জীবনকে উপভোগ করতে চায়। জীবনকে আনন্দমুখর করতে চায়। খেলাধুলা মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। খেলাধুলা মানবজীবনে আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টিতে অত্যন্ত সহায়ক। খেলাধুলা বিনোদনের উত্তম মাধ্যম। মানুষের সুস্থ-সুন্দর বিকাশের জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অনেক বেশি।

খেলাধুলার প্রকারভেদ

খেলাধুলা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে ঘরোয়া খেলাধুলা, অপরটি হচ্ছে মাঠে-ময়দানের খেলাধুলা। এই দুই শ্রেণীর খেলার মাঝে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক – দু রকম খেলাই হতে পারে। আমাদের দেশীয় খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু, কাবাডি, কানামাছি, বৌচি, গোল্লাছট, লুডু, ক্যারম ইত্যাদি প্রধান। আন্তর্জাতিক খেলার মধ্যে রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, দাবা, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ইত্যাদি। জাতীয় জীবনে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক – এ দুই ধরনের খেলাই আবশ্যিক। আমাদের দেশে দুই ধরনের খেলাই প্রচলিত আছে।

আমাদের দেশীয় খেলাধুলা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নানা রকম খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে। কোনো কোনোটি শহরেও জনপ্রিয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পাচ্ছে। গ্রামবাংলার উল্লেখযোগ্য খেলাগুলো হল : লাঠিখেলা, হা-ডু-ডু, কাবাডি, গোল্লাছট, কুস্তি, ডাংগুলি, একা-দোকা, লুকোচুরি, নোনতা, নৌকাবাইচ, মার্বেল খেলা, দাড়িয়াবাঁধা, ঘুড়ি ওড়ানো, বৌচি ইত্যাদি। এ

ছাড়া প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে সাঁতার, পাশা, দাবা, তাস ইত্যাদি। আমাদের এ সব দেশীয় খেলা শিখতে বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। ঘুড়ি উড়ানো আমাদের দেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। গ্রামবাংলার এ সকল খেলা চমৎকার ক্রীড়াকৌশল, বুদ্ধির প্রয়োগ ও জয়-পরাজয়ের তীব্র উত্তেজনার গুণে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বিদেশি খেলা

ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। ঠিক তেমনি বিদেশি বহু খেলা দেশি খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বিদেশি খেলাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ওয়াটার পোলো, মুষ্টিযুদ্ধ, ভলিবল, জুডো, শুটিং ইত্যাদি।


খেলাধুলার ধরন ও প্রকৃতি

খেলা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। ছেলেই হোক আর বুড়োই হোক, জন্মের পর থেকে মানুষ আপন মনে খেলা করে। তবে, খেলাধুলার ধরন বা প্রকৃতি সব যুগে এক রকম ছিল না। খেলাধুলার প্রকৃতি ও কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। ছোট শিশুরা পছন্দ করে পুতুল, বল, হাঁড়িপাতিল ইত্যাদি নিয়ে খেলতে। শৈশব পার হতে হতে তারা খেলতে শেখে হা-ডু-ডু, কানামাছি, বৌচি, ক্রিকেট, ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি। বৃদ্ধরা সাধারণত ঘরে বসে দাবা ও পাশা খেলতে পছন্দ করে।

বিলুপ্ত-প্রায় খেলা

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা খেলার অনেকগুলোই বিদেশি কিছু খেলার প্রভাবে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশের খেলাগুলোর মধ্যে ডাংগুলি, হা-ডু-ডু, সাঁতার, নৌকাবাইচ, কানামাছি ইত্যাদি খেলার এক সময় খুবই জনপ্রিয়তা থাকলেও বর্তমানে এগুলোর স্থান দখল করে নিয়েছে আন্তর্জাতিক মানের বহুল প্রচারিত কিছু খেলা। বর্তমান প্রজন্মের বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীরা আবহমান বাংলার খেলাগুলোর কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে। তারা এখন খেলা বলতে ফুটবল ও ক্রিকেটকেই বুঝে থাকে।

উপসংহার

গ্রামবাংলার সকল খেলাধুলার মধ্যে এদেশীয় জীবন ও প্রকৃতির নিবিড় পরিচয় আছে। খেলার বিভিন্ন নিয়মাবলি, জয়-পরাজয় নির্ণয়ের কৌশল, উপকরণ, আয়োজনের স্থান, কাল ইত্যাদির মধ্যে বাঙালি-জীবন ও সংস্কৃতির গভীর ছোঁয়া পাওয়া যায়। এ দেশে খেলাধুলার সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য দেশের সরকার ও জনগণ- সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। 

বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল

ভূমিকা

অপরূপ সৌন্দর্যে, শস্যসম্পদে ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই বাংলাদেশ। নানান রকম পাখি আমাদের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে করে তুলেছে বৈচিত্র্যময়। আপন সৌন্দর্যে, গানে, চঞ্চলতায় দোয়েল এদের মধ্যে অন্যতম। দোয়েল বাংলাদেশের জাতীয় পাখি।

আকার-আকৃতি ও সৌন্দর্য

দোয়েল সাদা-কালোয় সজ্জিত বুলবুল আকৃতির খাটো লেজবিশিষ্ট পাখি। পুরুষ দোয়েলের উপরিভাগ চকচকে নীলাভ কালো। ডানা স্পষ্ট সাদা লম্বা দাগসহ কালচে বাদামি রঙের। স্ত্রী দোয়েলের দেহের কালো অংশগুলো বাদামি এবং ময়লা বালুর মতো দেখায়।

প্রকৃতি

দোয়েল খুব প্রাণচঞ্চল পাখি। দালানের ফাঁকফোকরে ও গাছের প্রাকৃতিক খোঁড়লে কিংবা ঝোপঝাড়ুে এরা বাসা বাঁধে। সাধারণত ঝোপঝাড়ুে, বনে-বাদাড়ে ও গ্রামের লোকালয়ে জোড়ায় জোড়ায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। দোয়েলকে গানের পাখি বলা হয়। এরা মিষ্টি মোলায়েম শিষ দেয় ও লেজের ডগা নাচায়। স্থিরভাবে বসে থাকলে এদের লেজ মোরগের লেজের মতো দেখায়। প্রজনন-ঋতুতে পুরুষ দোয়েল খুব ভোরে ও পড়ন্ত দুপুরে সুরেলা গলায় খুব জোরে গান গায়। অন্য পাখির ডাকও এরা নকল করতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাই এদের প্রজনন ঋতু। স্ত্রী দোয়েল ৩ থেকে ৫টি ডিম দেয়। সাধারণত ডিমের রং লালচে বাদামি আভা ও ছোপযুক্ত নীলাভ সবুজ হয়ে থাকে। স্ত্রী দোয়েল ডিমে তা দেয় ও বাচ্চা ফোঁটায়। দোয়েল পোকা-মাকড় ও কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। এরা সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

জাতীয় পাখি দোয়েল

বাংলাদেশের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক পাখি দেখা যায়। বাংলার এই সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে দোয়েল পাখি যেন অভিন্ন হয়ে আছে; তাই দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। ঢাকায় শিশু একাডেমীর দক্ষিণ-পশ্চিম চৌরাস্তার মোড়ে জাতীয় পাখি দোয়েলের বৃহৎ আকারের সুন্দর ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে। স্থানটিকে বলা হয় ‘দোয়েলচত্বর’।

উপসংহার

ভূ-মণ্ডলের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সীমানায় দোয়েলের আধিক্য থাকায় দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিটি পশু-পাখিরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দোয়েল ভারসাম্যপূর্ণ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। তবেই এই সুন্দর পাখিটি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও স্বভাব নিয়ে বিচরণ করতে পারবে। 📖

বাংলাদেশের জাতীয় পশু

রয়েল বেঙ্গল টাইগার

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরবন নানান প্রজাতির বন্য-প্রাণীর আবাসস্থল। রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানকার বন্য প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম স্তন্যপায়ী প্রাণী। রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু।

আকৃতি ও সৌন্দর্য

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গায়ের বর্ণ গাঢ় হলুদ থেকে লালচে হলুদ এবং তাতে লম্বা কালো ডোরা থাকে। এই ডোরা উঁচু এবং পেছন দিকে বেশি। পেটের দিকটা সাদাটে। হলুদ রঙের লেজে অনেকগুলো কালো ডোরাকাটা দাগ আর লেজের আগা কালো। কানের পেছন দিকটা কালো রঙের, তাতে একটি স্পষ্ট সাদা দাগ। মাথাসহ বাঘের দৈর্ঘ্য ১৪০ থেকে ২৮০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ৯৫ থেকে ১১০ সেন্টিমিটার। এদের ওজন ১১৫ থেকে ২৮০ কেজি।

স্বভাব

রয়েল বেঙ্গল টাইগার সাধারণত নিঃসঙ্গ। কখনও কখনও জোড়া বেঁধে থাকে। এরা প্রধানত নিশাচর। গরু, মহিষ, হরিণ, বুনো শূকর, সজার ইত্যাদি শিকার করে খায়। বড় আকারের একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দৈনিক মাংস চাহিদা গড়পড়তা ৮ থেকে ৯ কেজি। এরা নিজের দ্বিগুণ বড় জন্তু শিকার করতে পারে। বাঘিনী একসঙ্গে ২ থেকে ৫টি বাচ্চা প্রসব করে। গর্ভকাল ১৪ থেকে ১৫ সপ্তাহ। মায়ের যত্নে বাচ্চারা ৪-৫ মাস লালিত-পালিত হয়। বাচ্চা এক বছরেরও বেশি সময় মায়ের সাহচর্যে থাকে।

বাসযোগ্য স্থান

রয়েল বেঙ্গল টাইগার সহজেই গরম আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে নিতে পারে। উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য, ম্যানগ্রোভ জলাভূমি, পত্রগোচর বন-সর্বত্রই বসবাস করতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল, চীন ও পশ্চিম মায়ানমার এদের আবাসভূমি। এক সময় বাংলাদেশের সবগুলো বনেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছিল। এখন শুধু সুন্দরবনেই এরা বসবাস করে।


উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

বাংলাদেশের সকল বন্যপ্রাণীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পেলে সুন্দরবনে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের নয়ন সার্থক হয়। এই প্রাণী আমাদের শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। মৃত বাঘের চামড়া অত্যন্ত মূল্যবান।

উপসংহার

বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া, খাবারের অভাব, অবৈধ শিকার এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে এই জাতীয় পশু অত্যন্ত বিপন্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ও

রচনা সম্ভার

বিধিমালা প্রণয়ন করেছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণীসংরক্ষণের প্রতি জনগণের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। অতএব, প্রয়োজন অবৈধ শিকার বন্ধ করা, প্রাণীদের সুরক্ষা ও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ করা। তবেই আমাদের এই জাতীয় পশুসহ সকল বনপ্রাণী বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। 

মহাস্থানগড়

ভূমিকা

বাংলাদেশে যে কয়টি ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে, মহাস্থানগড় তার মধ্যে প্রাচীনতম। এই পুরাকীর্তিটিতে সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ নগর পুন্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

অবস্থান ও গঠন

করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই পুরাকীর্তিটি বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। চতুষ্পার্শ্বের কৃষিজমির চেয়ে গড়ে প্রায় ৫ মিটার উচুে অবস্থিত এই দৃষ্টিনন্দন পুরাকীর্তি স্থানটি একটি আয়তাকার টিবি, যার দৈর্ঘ্য ১৫২৪ মিটার এবং প্রস্থ ১৩৭০ মিটার। আয়তাকার এই ধ্বংসস্তুপটির পূর্ব-পশ্চিমে নদী সমতল থেকে ৬ মিটার উঁচু একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত এবং উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক একটি গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ১৮৭৯ সালে এই ধ্বংসাবশেষের প্রথম খনন কাজ করা হয়। খননকালে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা পুন্ড্রনগল (পুন্ড্রনগর) ফলক পাওয়া যায়। এ থেকে মনে করা হয় যে, নগরটি সম্ভবত মৌর্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পরবর্তীতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা সাতটি যুগকে চিহ্নিত করেছে।

প্রথম যুগ

এ পর্যায়ে রয়েছে প্রাক মৌর্য যুগের পুরাকীর্তি। বিপুল পরিমাণে উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ পাত্র, লাল ও ধূসর রঙের পাত্র, পাথরের যাঁতা, চুলা, মাটির ঘর প্রভৃতি এ সময়ের স্বাক্ষর বহন করে।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগের প্রত্নসম্পদের মধ্যে রয়েছে ভাঙা টালি, পোড়ামাটির পাতকুয়া, রিং স্টোন, ব্রোঞ্জের আয়না, পোড়ামাটির জীবজন্তু, পাথরের গুটি ইত্যাদি। এগুলো মৌর্য যুগের নিদর্শন।

তৃতীয় যুগ

এ যুগে পাওয়া যায় ইট ও পোড়ামাটির স্থাপত্য, পাথর পুঁতি, রৌপ্যনির্মিত তৈজসপত্র ও অলঙ্কার। এগুলো মৌর্য যুগের পরবর্তী সময়কে নির্দেশ করে।

চতুর্থ যুগ

এ সময়ের নিদর্শন শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রচুর পোড়ামাটির ফলকচিত্র, খোদাই ও নকশাসহ রান্নার পাত্র। কাচের চুড়ি ও পোড়ামাটির সিলমোহর ইত্যাদি। অনুমান করা হয় এগুলো কুষাণ গুপ্ত যুগের নিদর্শন।

পঞ্চম যুগ

এ যুগ গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের পরিচয় বহন করে। ইট নির্মিত বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পোড়ামাটির ফলক, সিলমোহর, কাচ, পাথর, পুঁতির মালা, লোহার দ্রব্য ও ছাপ দিয়ে নক্সা করা পাত্র ইত্যাদি এ যুগের নিদর্শন।

ষষ্ঠ যুগ

এযুগটি পাল যুগকে নির্দেশ করে। এ পর্যায়টি সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এ যুগে মানকালীর কুডধাপ, পরশুরামের প্রাসাদ, বৈরাগীর ভিটা এবং নগরের বাইরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ইমারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।


সপ্তম যুগ

এ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মুসলিম সংস্কৃতিকে বহন করে। ১.৫ গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এ যুগের অন্যতম নিদর্শন। মহাস্থানগড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অর্থাৎ তৎকালীন পুণ্ড্রনগরের উপকণ্ঠে আরো সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস করেন।

মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপি

বগুড়ার এই মহাস্থানগড়ে ব্রাহ্মীরীতিতে উৎকীর্ণ একটি খচিত শিলালিপি পাওয়া গেছে। আনুমানিক তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দে (মৌর্যযুগে) এটি লিখিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। এটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম লিপিতাত্ত্বিক দলিল। এই লিপির ভাষা মাগধী প্রভাবিত প্রাকৃত ভাষা। এই লিপিতে শহর ও শহরতলির অধিবাসীদের দুর্দশা দূর করার নির্দেশ আছে। এটি পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ি প্রচলনের বিষয়েও আলোকপাত করে।

উপসংহার

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের এই ঐতিহাসিক নিদর্শন বাংলায় প্রথম নগরায়ণের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেয়। একে রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। 

আমাদের গ্রাম

গ্রামের নাম ও অবস্থান

আমাদের গ্রামের নাম ‘রাধা কানাই’। এই গ্রামেই আমার জন্ম। এটি ময়মনসিংহ জেলায় ফুলবাড়িয়া থানায় অবস্থিত একটি উন্নয়নশীল গ্রাম। ময়মনসিংহ শহর থেকে আনুমানিক পাঁচ মাইল দূরে এই গ্রামের অবস্থান।

আয়তন ও লোকসংখ্যা

ফুলবাড়িয়া গ্রামটির আয়তন প্রায় ৫৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছাব্বিশ হাজারের মতো। ছোট-বড় পনেরটি পাড়া বা মহল্লা নিয়ে গ্রামটি গঠিত।

রচনা সম্ভার

ভূ-প্রকৃতি

এখানকার ভূ-প্রকৃতি অনেকটাই পাহাড়ি। কিন্তু ভূমি অত্যন্ত উর্বর। খাল-বিল ও কর্ষণযোগ্য ভূমি এখানকার মানুষকে জীবিকা হিসেবে কৃষি বেছে নিতে সহায়তা করেছে।

জনশ্রুতি

এই গ্রামে মুক্তাগাছার জমিদার বকুল আচার্য চৌধুরীর খননকৃত দুইটি দিঘি ‘রাধা’ ও ‘কানাই’ এই গ্রামের জনসেবা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল বলে এই গ্রামের নাম ‘রাধা কানাই’ হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

আমাদের গ্রামটিতে নাগরিক চাকচিক্য নেই। কিন্তু সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যেন সবুজের লীলানিকেতন। রাজধানী ঢাকা থেকে শালবনের ভিতর দিয়ে পিচঢালা পথ পার হয়ে আমাদের গ্রামের দিকে যেতে হয়। যতদূর চোখ যায় সবুজ মাঠ, ফুল ও ফলবান বৃক্ষ, তৃণলতাবেষ্টিত মনোরম শোভা আর শস্য-শ্যামল খেত। মেঠো পথগুলো কাঁচা ও পাকা রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যে এখানকার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্মের তাপদাহে শুষ্ক প্রকৃতি বর্ষার আগমনে স্নিগ্ধ শ্যামল হয়ে ওঠে। শরতের আকাশের শুভ্রতায় আর হেমন্তের পাকাধানের গন্ধে প্রকৃতির রূপ বদলায়। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়, বসন্তে কোকিল ডাকে। বাংলার চিরায়ত রূপ চোখে পড়ে আমাদের এই ছোট গ্রামটিতে।

উৎপন্ন দ্রব্য

আমাদের গ্রামের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, পাট এবং রবিশস্য। প্রায় সকল প্রকার মৌসুমি ফল যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, করমচা, কদবেল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এই এলাকার কাঁঠাল সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ।


উপজীবিকা

এখানে অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। গ্রামের কিছু লোক নিজ গ্রামে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসা করেন। এ ছাড়াও কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, গাড়োয়ান, কবিরাজ, শিক্ষক সকল শ্রেণীর পেশাজীবী লোক এখানে বসবাস করেন।

জনকল্যাণ ও স্বাস্থ্যসেবা

এই গ্রামে একটি স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ কেন্দ্র আছে। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, ব্যাংক, এতিমখানা, মাদ্রাসা, বালিকা ও বালক বিদ্যালয় আছে। এই গ্রামে শিক্ষা ও জনকল্যাণের জন্য নিবেদিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনাব মোখলেছুর রহমান, জনাব মজিবুর রহমান, জনাব হামেদ আলী সরকার, জনাব জবেদ চৌধুরী, জনাব মোবারক তরফদার প্রমুখ।

উপসংহার

আমাদের এই ছোট গ্রামটিতে ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বসবাস করেন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যারা শহরে বসবাস করছেন তাঁরা আমাদের সম্পদ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলব। 

লালবাগ দুর্গ

ভূমিকা

বাংলাদেশের যে কয়টি ঐতিহাসিক স্থান দর্শনার্থী ও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, লালবাগ দুর্গ তার মধ্যে অন্যতম। এই স্থাপত্যকীর্তিটি মুঘল যুগের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অবস্থান

পুরাতন ঢাকা নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি অসম্পূর্ণ মুঘল প্রাসাদ দুর্গ। যুবরাজ মুহম্মদ আজম বাংলার সুবাদার থাকাকালীন ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। কিন্তু নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার আগেই দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। তাঁর উত্তরসূরি শায়েস্তা খান ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করলেও দুর্গের কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবি এখানে মারা গেলে দুর্গটি অপয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অসমাপ্তই রয়ে যায়।

অবকাঠামো

দুর্গটিতে প্রধান তিনটি ভবন রয়েছে। ভবনগুলো হল মসজিদ, পরী বিবির সমাধিসৌধ এবং দিউয়ান-ই-আম। এ ছাড়া আছে দুটি প্রবেশ পথ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত একটি দুর্গ। দুর্গটিকে প্রাচীরের অংশের সমন্বয় হিসেবে ধরা হত। তবে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননের মাধ্যমে এখানে আরও কিছু ভবন-কাঠামোর অস্তিত্ব খুঁজে বের করে। বর্তমানে ১৮ একর বিস্তৃত দুর্গ এলাকায় খনন-কাজের ফলে ২৬/২৭টি কাঠামোর অস্তিত্বসহ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ছাদ-বাগান, ঝর্ণা ইত্যাদির ধংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংস্কারের পর লালবাগ দুর্গ এখন বেশ খানিকটা উন্নত রূপ ধারণ করেছে। লালবাগ কেল্লার স্থাপত্যশিল্প দর্শনার্থী ও ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রবেশপথ

দুর্গে বিদ্যমান তিনটি প্রবেশপথের মধ্যে দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথটি সর্ববৃহৎ এবং দেখতে অনেকটা তিনতলা ভবনের মতো। এর পাশে রয়েছে সরু সরু মিনার। উত্তর-পূর্ব দিকের প্রবেশপথটি ছোট এবং সাধারণ মানের। এর কাঠামোগত অস্তিত্ব ইজিত দেয় যে, দুর্গটি পূর্ব দিকে বর্তমান শায়েস্তা খান সড়ক ছাড়িয়েও বিস্তৃত ছিল।

তোরণ

দুর্গের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরটি দক্ষিণ তোরণ থেকে উদ্ভূত। প্রাচীরটি পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়ে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বিশাল প্রতিরক্ষা বুরুজে (Bastion) গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের প্রবেশপথদ্বয়ের সংযোগকারী পূর্ব দিকের সীমানা প্রাচীরটি আধুনিককালে নির্মিত। দক্ষিণ প্রাচীরের উত্তর পাশে উপযোগমূলক ভবনগুলো যেমন, আস্তাবল, প্রশাসনিক ব্লক এবং এর পশ্চিমাংশে ঝর্ণা ও জলাশয়সহ একটি সুন্দর ছাদবাগান ছিল। পশ্চিম প্রাচীরের পূর্ব পাশে, প্রধানত মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবাসিক ভবনগুলো ছিল।

রচনা সম্ভার

প্রতিরক্ষা বুরুজ


আদিতে দক্ষিণ প্রাচীরে নিয়মিত বিরতিতে পাঁচটি এবং পশ্চিম প্রাচীরে দুটি প্রতিরক্ষা বুরুজ ছিল। কেন্দ্রীয় বুরুজটিতে একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ ও দ্বিতীয় বুরুজের ছাদে জলাধার ছিল যা হাওয়াখানার কাজে ব্যবহৃত হত।

ভবন

দুর্গের কেন্দ্রীয় অংশ জুড়ে রয়েছে তিনটি ভবন। পূর্ব দিকে দিউয়ান-ই-আম ও হাম্মাম, পশ্চিমে মসজিদ এবং এগুলোর মাঝখানে পরী বিবির সমাধি সৌধ। এগুলো একই রেখায় অবস্থিত, তবে সমদূরত্বে অবস্থিত নয়। ঝর্ণাসমৃদ্ধ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি নহর তিনটি ভবনকে সংযুক্ত করেছে। এই দুর্গটিতে বেশ কয়েকটি পানির নহর আছে। এগুলো মুঘল স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বহন করে। পশ্চিম দিকে দিউয়ান-ই-আম একটি বিশাল ভবন। এখানে রান্নাঘর, চুল্লি, পানির আধার, বাথটাব, শৌচাগার, ড্রেসিংরুম, গরম পানির ভূগর্ভস্থ কক্ষ, ঝাড়ুদারদের অলিন্দ ইত্যাদি আধুনিকতার প্রমাণ বহন করে। পরী বিবি সমাধিসৌধটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এখানে আটটি কক্ষ রয়েছে। গম্বুজগুলো ব্রাস পাত মোড়ানো, দেওয়াল মার্বেল পাথরের। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি সমাধি রয়েছে। অনুমান করা হয় এটি পরী বিবির আত্মীয় শামশাদ বেগমের সমাধি।

এ ছাড়া আছে লালবাগ মসজিদ। এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট। এর পূর্ব দিকে অজু করার জন্য একটি জলাধার রয়েছে। লালবাগ দুর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে সুলতানি যুগ এবং প্রাক মুসলিম যুগের স্তর উন্মোচিত হয়েছে।

উপসংহার

লালবাগের দুর্গ একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থানের সজ্ঞা পরিচিত হওয়া এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিকে রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আমরা সচেতন নাগরিক হিসেবে এই স্মৃতিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারের নির্দেশাবলি মেনে চলব। 

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ভূমিকা

মনের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন হল ভাষা। মানুষ তার মাতৃভাষার মাধ্যমেই মনের ভাব আদান-প্রদান করে থাকে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় ও ঐতিহ্যবাহী দিন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক দিন এটি। বাঙালির রক্তঝরা এ দিনটিকে সারা বিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে ইউনেস্কো ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্মান জানিয়েছে ভাষা - শহীদদের প্রতি।

মাতৃভাষার গুরুত্ব

প্রত্যেক জাতির কাছেই মাতৃভাষা পরম শ্রদ্ধার বিষয়। মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকাশ করে তার যত ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ অনুভূতি। মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা ছাড়া মানুষের মৌলিক চিন্তা ও সৃজনশীলতার প্রকাশ সম্ভব হয় না। ভাষাগত পরাধীনতা মানুষের মৌলিক চিন্তাকে কখনোই বিকশিত হতে দেয় না। ভাষা যদি মাতৃভাষা না হয়ে

বিদেশি ভাষা হয় তবে তা কখনোই মানুষের প্রাণ স্পর্শ করতে পারে না। তাই মাতৃভাষা জাতীয় জীবনে পরম আদরের ও গর্বের ধন এবং এর গুরুত্বও অপরিসীম।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন ‘উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। এর প্রতিবাদে ২৬শে মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। তারপর ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা দেয় সরকার। কিন্তু ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নামলে পুলিশ নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রফিক, শফিক, জব্বার, সালাম, বরকত এবং নাম না জানা আরো অনেকে। অতঃপর সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।


আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর শুধু আমাদের মাতৃভাষা দিবস নয়, এখন থেকে প্রতি বছর ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সারা বিশ্বে পালিত হবে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে। এর পূর্বে ইউনেস্কো-র সেক্রেটারিকে এ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে সর্বসম্মতভাবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের অনন্য ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং ১৯৫২ সালের এই দিনের শহীদদের স্মৃতিকে সারা বিশ্বে স্মরণীয় করে রাখতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয় ইউনেস্কো।

মাতৃভাষা দিবসের অঙ্গীকার

একুশ আমাদের অহংকার। আমাদের জাতীয় চেতনার ভিত্তিমূল। এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বাঙালি জাতি তথা বাংলা ভাষাভাষীর দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক বেশি সম্প্রসারিত হল। আমাদের মাতৃভাষার গৌরবকে আরও বেশি সমুন্নত রাখার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হল। স্যাটেলাইট সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন সংকট থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করার শপথ নেবার দিন আজই।

উপসংহার

‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ অমর একুশের ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের একটি মহান স্বীকৃতি। এ দিবসের মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি ভাষাই তার আপন অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রশ্নে উজ্জীবিত হবে। আমরা আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাকে অক্ষণ্ন রাখব, ভাষা তথা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব। 

আমাদের বিদ্যালয়

সূচনা

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম সূর্যমণি নিউমডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় যা দীর্ঘদিন যাবৎ বহু মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসছে।

অবস্থান

আমাদের বিদ্যালয়টি বাউফল উপজেলার প্রায় তিন মাইল দূরে প্রকৃতির অপূর্ণ সুন্দর এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব মোতাহার উদ্দিন হাওলাদার।

পরিবেশ

আমাদের বিদ্যালয়টি বেশ খোলামেলা স্থানে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের সামনে একটি বড় মাঠ আছে। মাঠের দক্ষিণ পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে গেছে। মাঠের উত্তর পাশে সারি সারি দেবদারু গাছ এবং পূর্ব দিকে মৌসুমি ফুলের বাগান।

বিদ্যালয়ের পঠনব্যবস্থা

আমাদের বিদ্যালয়-গৃহটি পাকা। এর দুটি পৃথক অংশ আছে। এক অংশে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং অন্য অংশে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বসে ক্লাস করে। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে। যেহেতু আমাদের গ্রামে পৃথক কোনো বালিকা বিদ্যালয় নেই সেহেতু ছেলে-মেয়ে উভয়ই আমাদের বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করে। এ বিদ্যালয়ে তিরিশজন শিক্ষক কর্মরত আছেন। শিক্ষকগণ উচ্চ শিক্ষিত ও শিক্ষার কাজে যথেষ্ট পারদর্শী। প্রধান শিক্ষক একজন এম.এ.এম.এড। তিনি খুব দক্ষ প্রশাসক ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি উপরের শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ান। আমাদের বিদ্যালয়টি বহুমুখী। এখন নবম ও দশম শ্রেণীতে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসা শিক্ষা- এই তিনমুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সমাবেশ

আমাদের বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় সকাল এগারটায়। তার আগে বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা লাইন করে দাঁড়ায়। সকলে শপথবাক্য পাঠ করে এবং পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে।


শিক্ষাসম্পূরক কার্যাবলি

আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার শেষ ঘণ্টার পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতি বছর বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ সম্মানের সঙ্গে পালন করা হয়। শিক্ষা-বর্ষের শুরুতে মিলাদ মাহফিলও অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের বিদ্যালয়ে নানা রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। আমাদের বিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের লেখা নিয়ে স্কুল-বার্ষিকী প্রকাশিত হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই ভালো। এ বিদ্যালয় থেকে যারা পাস করেছেন পরবর্তীকালে শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্মানিত প্রাক্তন এই ছাত্রগণ আমাদের গৌরব।

উপসংহার

আমাদের বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়। আমরা সবাই একে খুব ভালোবাসি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে গৌরব বোধ করি। 

ধান

ভূমিকা

সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। বিশ্বের চাষযোগ্য জমির পরিমাণের হিসাবে গমের পরই ধানের অবস্থান। ধান বাংলাদেশে সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধান ছাড়া বাঙালি জীবন কল্পনা করা যায় না।

উৎপত্তি স্থান

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কিছু না কিছু ধানের চাষ হয়। তবে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় যত ধান হয় অন্য কোথাও তত হয় না। এর মধ্যে বাংলাদেশ, চীন, জাপান, মায়ানমার, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর আমেরিকা এবং ভারতের পশ্চিমবাংলা রাজ্যে অধিক পরিমাণে ধানের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বৃহত্তম বরিশাল জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় বলে বরিশাল জেলাকে বাংলাদেশের শস্যাগার বলা হয়।

ধানগাছ

ধানগাছকে এক জাতীয় তৃণ বলা যেতে পারে। ধান পাকলেই ধানগাছ মরে যায়। প্রতি বছর নতুন করে এর চাষ করতে হয়। ধানগাছ সাধারণত দু-তিন হাত লম্বা হয়ে থাকে। নিচু জলাভূমিতে ধানগাছ সাত-আট হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এ জাতীয় ধানগাছ পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে। প্রতিটা ধানগাছের আগার দিকে একটা করে ধানের ছড়া বের হয়। এক মাস হতে দেড় মাসের মধ্যে সে ছড়া পেকে সোনালি রঙের পাকা ধানে পরিণত হয়।

চাষ প্রণালি

শীতের শেষে ধানের জমি চাষ করা শুরু হয়। উত্তমরূপে জমি চাষ করার পরে মাড়াই দিয়ে ধানের খেত প্রস্তুত করতে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দু-এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপন করতে হয়। ধানের চারা এক ফুটের মতো উঁচু হলেই খেতের আগাছা নিড়িয়ে ফেলতে হয়। আষাঢ়ের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাস, এমনকি ভাদ্র মাসেও আউশ ধান পাকে। আউশ ধান যখন কাটা হয় আমন ধানের চারা তখন বড় হতে থাকে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে বীজতলায় আমন ধানের বীজ বপন করে চারা উৎপন্ন করা হয়। এ চারা উঠিয়ে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রোপা আমন লাগানো হয়।

রচনা সম্ভার

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে আমন ধান পাকে। তখন ধান কাটা হয়। এ ছাড়া বর্তমানে বছরের যে কোনো ঋতুতে পানি সেচের সাহায্যে আমাদের দেশে ইরি ধানের চাষ করা হয়।

ধানের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বেশ কয়েক প্রকারের ধান জন্মে। আউশ, আমন, ইরি, বোরো ইত্যাদি এদের মধ্যে প্রধান। আমাদের দেশে আমন ও ইরি ধানের চাষ অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। বরিশালের বালাম, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, চিনি গুঁড়া, কালোজিরা ইত্যাদি চাল বিখ্যাত।


ব্যবহারের নিয়মাবলি

পাকা ধান কেটে এনে তা মাড়িয়ে নিতে হয়। পরে তা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে সিদ্ধ করে শুকিয়ে টেকি অথবা ধান ভানা মেশিনের সাহায্যে ভেঙে চাল প্রস্তুত করা হয়। চাল হতে আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত প্রস্তুত হয়। তবে চাল গুঁড়ো করে নানা প্রকার পিঠা, পায়েস, ফিরনি প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়। এ ছাড়া চাল হতে খৈ, মুড়ি, চিড়া, পোলাও ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে। ধান শর্করা জাতীয় খাদ্য, ধানজাত খাদ্য আমাদের শরীরে শক্তি যোগায়, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

ধানখেতের সৌন্দর্য

ধানের খেত দেখতে খুবই সুন্দর। কচি কচি ধানগাছ সতেজ হয়ে যখন পানির উপর মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন সারা মাঠ সবুজ হয়ে যায়। ধান খেতের ওপর দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায় তখন মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঢেউ খেলে যায়। এ দৃশ্য দেখতে সত্যিই খুব মনোরম। তারপরে আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন ধান পাকে, তখন সারাটি মাঠ হঠাৎ যেন সোনালি হয়ে যায়। সূর্যকিরণের সোনালি আভা এক অপূর্ণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

উপসংহার

যে ধানের ওপর আমাদের জীবন নির্ভরশীল তার উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে উন্নত পদ্ধতি বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। এদেশের কৃষকরা এখনো আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে চাষাবাদ করার সক্রিয় প্রেরণা ও শিক্ষা পায়নি। সরকার অবশ্য ধানচাষের আধুনিকীকরণের জন্যে বহু প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দানের নিমিত্তে সকল পর্যায়ে কৃষিকর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এই অতি প্রয়োজনীয় শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই সম্ভব আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। 

বাংলাদেশের ষড়ঋতু

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রতিটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ—এই দুইটি কারণে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশেও প্রতি দু মাস অন্তর অন্তর এক একটি ঋতু নিজস্ব ভিন্নতা নিয়ে হাজির হয়। বাংলাদেশে বছরের বার মাসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয়টি ঋতুর পালা-বদল

হয়। এই ঋতু পরিবর্তনের মধ্যে যেমন নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা রয়েছে, তেমন রয়েছে প্রতিটি ঋতুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য।

গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মকালকে ষড়ঋতুর প্রথম ঋতু হিসেবে গণনা করা হয়। কারণ বাংলা বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় মাস অর্থাৎ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ— দুই মাস নিয়ে গ্রীষ্মকাল। এই সময়ে সূর্য বাংলাদেশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে প্রখর উত্তাপে দগ্ধ হয় বাংলাদেশের প্রকৃতি। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল সব শুকিয়ে খাঁ খাঁ করে। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, রাধাচূড়া আর জামরুল গ্রীষ্মকালের ফুল। গ্রীষ্মকাল সম্পর্কে কবি বলেছেন :

ঘাম ঝরে দরদর গ্রীষ্মের দুপুরে

খাল-বিল চৌচির জল নেই পুকুরে।

এই সময়ে বিভিন্ন রকম রসসমৃদ্ধ ফলের সমাহার দেখা যায়। যেমন আম, আতা, জাম, লিচু, কাঁঠাল, তরমুজ, বাজিা, আনারস ইত্যাদি। রসময় ফলের প্রাচুর্য থাকে বলে এই সময়কে ‘মধুমাস’ বলা হয়।

বর্ষাকাল

আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। আষাঢ়ের ধারায় বর্ষণ এই সময় গ্রীষ্মের শুষ্ক প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। খাল-বিল-নদী-নালা, পুকুর-ডোবা জলে থৈ থৈ করে। সবুজ তরলতা চারদিকে ছেয়ে যায়। বর্ষাকালের সুগন্ধি এবং হালকা রংযুক্ত ফুল ফোটে। বেলি, কামিনী, জুঁই, দোলনচাঁপা, হাস্সাহেনা, কেয়া, কদম বর্ষাকালের ফুল। বর্ষাকাল সম্পর্কে কবি বলেন :

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর

আউশের খেত জলে ভরভর

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার

ঘনায়েছে দেখ চাহিরে ॥

শরৎ

বাংলার তৃতীয় ঋতু শরৎ। ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। শরতের বড় বৈশিষ্ট্য আকাশে সাদামেঘ এবং জ্যোৎস্নাময় পরিপূর্ণ রাত আর শিশিরসিক্ত সকাল। শরতের ধানখেতগুলো কাঁচাপাকা শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শিউলি ফুলে ভরে যায় শিশিরছোঁয়া মাঠ। কাশবনে দোলা লাগে। কবি বলেন :

মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য

গন্ধে ভরিছে অবনী

জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত

শুভ্র কোন সে নবনী ॥

রচনা সম্ভার

হেমন্ত

কার্তিক-অগ্রহায়ণ এই দুই মাস হেমন্তকাল। হেমন্ত ফসলের ঋতু। কৃষকেরা এই সময় পাকাধান ঘরে তোলে। নতুন ধানের পিঠা আর খেজুরের রসে নবান্নের উৎসব হয়। পল্লিজীবন আনন্দে মুখরিত হয়। হিমেল বাতাস শীতের আগমনী বার্তা বয়ে আনতে থাকে।

শীত

পৌষ ও মাঘ মাস শীত ঋতুর সময়। এই সময়ে উত্তর পূর্ব দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। কুয়াশায় ঢেকে যায় প্রকৃতি। বাগান ভরে ওঠে রংবেরঙের ফুলে। এ সময় গাঁদা, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বকুল আর কুন্দ ফুল ফোটে। কুল, শাকআলু, কমলা শীতের ফল। শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। বনভোজন ও ভ্রমণের জন্য অনুকূল ঋতু শীত।

বসন্ত

বসন্ত বৎসরের শেষ ঋতু। ফাল্গুন-চৈত্র এই দুই মাস বসন্তকাল। এই সময় দখিলা বাতাস বইতে থাকে। মহুয়া, শিমুল, বকুল, পলাশ, অশোক ফোটে বসন্তকালে। শীতের ফোটাফুল তখনও গাছে গাছে শোভা পায়। কোকিল ডাকে আর প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। আমের মুকুলের গন্ধে ভরে ওঠে বসন্তের বাতাস। কবি গেয়ে ওঠেন:

আসে বসন্ত ফুল বনে

জাগে বনভূমি সুন্দরী ॥

উপসংহার

বৎসরের ছয়টি ঋতু নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি বাংলাদেশের জনজীবনও বৈচিত্র্যময়। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলে এদেশের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। 📖

বাংলাদেশের নদ-নদী

ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীবহুল বলে স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর প্রভাব অপরিণীম। সাত শতাধিক নদী নিয়ে সমৃদ্ধ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। প্রধান নদীগুলো হল পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী। এ নদীগুলোর অনেক উপনদী ও শাখা নদী রয়েছে।

পদ্মা

হিমালয়ের গাঙ্গেয়াত্রী হিমবাহ থেকে এই নদীর উৎপত্তি। ভারতে এই নদীর নাম গঙ্গা। এই নদী বাংলাদেশে এসে রাজশাহী, কুষ্টিয়া হয়ে দৌলতদিয়ায় যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তীতে চাঁদপুরের কাছে মেঘনায় মিলেছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মিলিত স্রোতধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পদ্মার শাখানদীসমূহ হল কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ; উপনদী— মহানন্দা, পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুত্র

এই নদী হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবরে উৎপন্ন হয়েছে। কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে ভৈরব বাজারে এসে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

যমুনা

ময়মনসিংহ জেলার কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নদী নামে পরিচিত। করতোয়া ও আত্রাই এর প্রধান উপনদী। ধলেশ্বরী এর শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখা নদী বুড়িগঙ্গা।

মেঘনা

সিলেটের সুরমা, কুশিয়ারা ও হবিগঞ্জের কালনী নদীর মিলিত শাখা মেঘনা নামে পরিচিত হয়ে ভৈরব বাজারে ব্রহ্মপুত্র ও চাঁদপুরে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী ইত্যাদি মেঘনার উপনদী।

কর্ণফুলী

আসামের লুসাই পাহাড়ে এই নদী উৎপন্ন হয়েছে। রাঙামাটি ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে কর্ণফুলী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কাসালং, হালদা এবং বোয়ালখালি এর প্রধান উপনদী।

সাজু

আরাকান পাহাড়ে এই নদীর উৎপত্তি। বান্দরবান ও চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।


নদী ও নদীর প্রভাব

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। নদী এদেশের কৃষিকাজের প্রধান সহায়ক। নদীর পলিমাটি কৃষি উৎপাদনকে বৃদ্ধি করে এবং নদীর পানি কৃষিভূমিতে সেচের মাধ্যমে বৃষ্টির অভাবকে দূর করে। নদীপথ বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াতের অন্যতম উপায়। নদী বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

নদীর সৌন্দর্য

নদীতে পালতোলা নৌকার সারি, মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান, পানকৌড়ি, গাঙচিল, আর বকের ঝাঁকের উড়ে বেড়ানোর সৌন্দর্য, কৃষ্ণ-বধূর নদীর পানিতে কলসি-ভরে নিয়ে যাবার দৃশ্য, জলজ উদ্ভিদ ভেসে বেড়ানোর সৌন্দর্য—সবকিছু মিলে নদী হয়ে ওঠে মনোমুগ্ধকর ও দৃষ্টিনন্দন।

উপসংহার

বন্যায় নদীর পানি প্লাবিত হলে বাংলাদেশে দুর্ভোগ নেমে আসে। কিন্তু তারপরও নদী এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নদীর কারণেই বাংলাদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। 

শখের কাজ

ভূমিকা

শখ শব্দটির অর্থ আগ্রহ বা মনের ঝোঁক। শখের কাজ বলতে বোঝায় লাভের আকাঙ্ক্ষা না রেখে চিত্তবিনোদনের জন্য কোনো কাজ করা। কর্মব্যস্ত সকল মানুষের জীবনেই থাকে কিছু না কিছু অপ্রয়োজনের আনন্দ। তাই সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনের বাইরেও মনের আনন্দে কিছু কিছু কাজ করে থাকে। এই কাজগুলোর মধ্যে কোনোটির প্রতি যদি অতিরিক্ত আকর্ষণ জন্মে যায় তবে সে কাজটাকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এ ধরনের কাজকেই বলা হয় শখ-ইংরেজিতে যাকে বলে Hobby।

শখের প্রকারভেদ

নানা রকম শখ মানুষের থাকে, যেমন- বাগান করা, ছবি আঁকা, মাছ ধরা, গান গাওয়া, বই পড়া, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করা, ডাক-টিকেট সংগ্রহ করা ইত্যাদি। আমার প্রিয় শখ ফুলের বাগান করা।

ফুলের বাগান

আমি ফুল খুব ভালোবাসি। আমার পড়ার ঘরের দক্ষিণ পাশেই আছে ছোট এক খণ্ড জমি। আমি আমার বাবার অনুমতি নিয়ে সেখানেই ফুলের বাগান করেছি। বাগানটি বেশ সুন্দর দেখায়। আমি নিয়মিত ফুলগাছগুলোর পরিচর্যা করি। আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা যখন আমার বাগানটির প্রশংসা করে তখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই।

নানা রকম গোলাপ

আমার বাগানের প্রধান আকর্ষণ রকমারি গোলাপ ফুল। টকটকে লাল, ফিকে লাল, সাদা, হলুদ, প্রভৃতি নানা রঙের গোলাপ আছে আমার বাগানে। সব গোলাপই আমার প্রিয়, তবে সবচেয়ে প্রিয় মিষ্টি গন্ধবিশিষ্ট গোলাপি রঙের গোলাপ।

অন্যান্য ফুল

আমার বাগানে গোলাপ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য স্থায়ী ফুলের গাছ। এদের মধ্যে গন্ধরাজ, হাস্সাহেনা, কামিনী, শেফালি, বেলি, জবা, টগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আছে নানা জাতের মৌসুমি ফুল : গাঁদা, ডালিয়া, সূর্যমুখী, জিনিয়া, দোপাটি, রজনীগন্ধা, কসমস ইত্যাদি। এ ফুলগুলো প্রতি বছরই নতুন করে আবাদ করতে হয়।


ফুল-গাছের পরিচর্যা

আমার ফুল বাগানকে কীভাবে সুন্দর করা যায় সেই নিয়ে সব সময় আমার চিন্তা। ঘুম থেকে উঠে আমি ফুলগাছে পানি দিই। অবসর সময়ে আমি বাগানে যাই, গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে আলগা করে দিই, গাছে সময়মতো সার দিই, আগাছা ফেলি, মাকড়সা বাসা বাঁধলে তা পরিষ্কার করি। বাগানের চারপাশে বাঁশের বাখারি দিয়ে বাবা সুন্দর ও মজবুত করে বেড়া বানিয়ে দিয়েছেন। আমি বাগানে সময়মতো নতুন গাছ লাগাই। ধীরে ধীরে মৃদু হিল্লোলে মাথা নেড়ে বেড়ে ওঠে এক একটি গাছ। তা দেখে পরম আনন্দও অনুভব করি আমি।

ফুল-গাছ সংগ্রহ

কী করে আমার বাগানটিকে ফুলে ফুলে ভরে তুলব সেই নিয়ে আমার ভাবনা। যেখানেই ফুলের গাছ পাই সেখান থেকেই আমি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি। বাবা মাঝে মাঝে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে নতুন নতুন ফুলের চারা এনে আমার বাগানে লাগাতে সাহায্য করেন।

উপসংহার

বাগানের কাজের জন্য আমার পড়ার কোনো ক্ষতি হয় না। বরং আমার ভাবতে ভালোই লাগে যে, এত সুন্দর শখের কাজ আমি বেছে নিয়েছি। আর শখের মধ্য দিয়েই মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। নানা রকম ফুলের সৌন্দর্য ও সুবাসে মনটা সর্বদাই আমার প্রফুল্ল থাকে। আমি আরো মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনাও করতে পারি। 

অধ্যবসায়

ভূমিকা

যে-সব গুণ মানবজীবনে সাফল্য আনতে সক্ষম তাদের মধ্যে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জীবন কখনো নিজে নিজে বিকশিত হয় না। এই জীবনকে বিকাশের পথে পরিচালিত করতে হয়। অধ্যবসায়ের মতো গুণ থাকলে জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর ও সার্থক। মানুষ মানবশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করলেই যথার্থ মানুষ হয় না। তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য দরকার মনুষ্যত্ববোধের উজ্জীবন। অধ্যবসায় মানবজীবনের এই গৌরবময় লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

কোনো কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করার মহৎ প্রবৃত্তিকে অধ্যবসায় বলে। অর্থাৎ অবিরাম সাধনা করবার প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের মধ্যেই অধ্যবসায়ের পরিচয়। এক কথায় জীবনে চলার পথে সফল হওয়ার জন্য বারবার যে সাধনা করা হয় তার নাম অধ্যবসায়। আজ পর্যন্ত মানুষ জীবনের সফলতা লাভের জন্য যতগুলো অভ্যাস আয়ত্ত করেছে, অধ্যবসায় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বলা চলে, অধ্যবসায় আত্মানুতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সোপান।

মানুষের জীবন শুধু সাফল্য বা অসাফল্য নয়। জীবনে ব্যর্থতা আছে বলেই সে সাফল্য অর্জনে এত আনন্দলাভ করতে পারে। মনে রাখতে হবে মানবজীবনের চলার পথে অসাফল্য কখনও স্থায়ী প্রতিবন্ধক নয়। অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করলে এই অসাফল্য অবশ্যই অপসারিত করা যায় এবং সাফল্যের মুকুট মাথায় শোভা পায়। তাই যে কোনো কাজে অকৃতকার্য হলেই নিরাশ হয়ে ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। বরং প্রবল শক্তির সঙ্গে চেষ্টা করে যেতে হবে। অনেক জটিল কাজ আছে যাতে প্রথম চেষ্টাতেই সফল হওয়া যায় না। তাই অসাফল্য আসলেও এই সকল কাজে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বার বার চেষ্টা করতে হয়। অবশেষে এই চেষ্টা বিফল হয় না। বরং সাফল্য আসে এবং সে সাফল্যের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হই।

রচনা সম্ভার

অধ্যবসায়ের অভাবে কী হয়

সাধারণত অধ্যবসায়ের অভাবের কারণে আমরা বহু ক্ষেত্রে কৃতকার্য হতে পারি না। লক্ষ করলে দেখব, একটি শিশু বার বার চেষ্টা করে দাঁড়াতে শেখে, কথা বলতে শেখে, চলতে শেখে। পরবর্তীতে আরো অনেক কিছু চেষ্টা করে শেখে। কয়েকবার বিফল হয়ে সে যদি চেষ্টা থেকে বিরত থাকত তবে কখনও কোনো কিছু সে শিখতে পারত না, কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারত না।


কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যদি প্রথম বা দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় ব্যর্থ বা অকৃতকার্য হয়ে অঙ্ক না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে তবে জীবনে সে আর অঙ্ক কষতে পারবে না, অঙ্ককে ভয় করবে। মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। কিন্তু প্রথম থেকেই তারা যদি মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করে যায় তাহলে তারা সফল হবেই। তার ফলে তাদের মনে প্রবল আত্মপ্রত্যয় আসবে এবং পরিণামে তাদের সাফল্য অর্জিত হবে।

অধ্যবসায়ের একটি দৃষ্টান্ত

স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুসের জীবন অধ্যবসায়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অগণিত ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েও তিনি বিফল মনোরথ হয়ে অধ্যবসায় ত্যাগ করেননি। পর পর ছ-বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি যখন এক পরিত্যক্ত দুর্গে চিন্তায় আত্মমগ্ন ছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি মাকড়সা জাল প্রস্তুত করতে ছয়বার অকৃতকার্য হয়ে বিরত না থেকে সপ্তমবারে সফল হয়। এই দৃশ্য তার মনে অসীম বল এনে দেয় এবং সপ্তমবার শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি শেষ পর্যন্ত জয়ী হন।

বর্তমানে আমরা যে দিকে তাকাই সেদিকেই বিদ্যুতের অপরিসীম মহিমা দেখি। আমরা অভিভূত হই। অথচ বিদ্যুতকে মানুষের সেবার উপযোগী করতে বিজ্ঞানীদের অবিরাম পরিশ্রম করতে হয়েছে। এভারেস্ট একদিনে জয় সম্ভব হয়নি। বার বার চেষ্টার পর পর্বত আরোহীরা এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে সক্ষম হয়েছেন।

উপসংহার

অতএব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অধ্যবসায় একান্ত আবশ্যিক। অধ্যবসায়হীন মানুষ কখনও কোনো কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। পশুর মতো আহার-বিহার করে মানুষের জীবন কাটে না। তাকে মানুষ হিসেবে সফল হতে হলে অবশ্যই অধ্যবসায়ী হতে হবে। 

শিষ্টাচার

ভূমিকা

মানুষের চরিত্রকে যে সমস্ত গুণাবলি সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং গৌরবান্বিত করে তোলে শিষ্টাচার তার মধ্যে অন্যতম। মনীষীরা বলে থাকেন, শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ মানব জীবনের অলঙ্কার। সুন্দর আদব-কায়দা মানব-চরিত্রের সম্পদ। যথাযথভাবে জীবনকে অন্যদের সামনে সুন্দর, শালীন ও বিকশিত করে তুলে ধরতে শিষ্টাচারের

প্রয়োজন রয়েছে। নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে মেলে ধরতে শিষ্টাচারের বিকল্প নেই। তাই মানবজীবনকে আকর্ষণীয় এবং স্মরণীয় করতে হলে শিষ্টাচার অপরিহার্য। নিয়মিত শিষ্টাচারের চর্চা এবং অনুশীলন তাই আবশ্যিক।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

যথার্থ সভ্য ও ভদ্র ব্যক্তিত্বের লোকের সমাজে চলাফেরায়, কথা-বার্তায়, আচার-আচরণের যে একটি বিশিষ্ট সৌজন্য ও ভদ্রতা পরিলক্ষিত হয় তাকেই শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা বলে। শিষ্টাচার পরিমার্জিত বুদ্ধির পরিচায়ক। এই শিষ্টাচার কেবল বিদ্যাবুদ্ধির মাধ্যমে গঠিত হয় না। পৃথিবীতে এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাদের পাণ্ডিত্যভিমাত্রীর অশিষ্টতা, অহংকার, বুদ্ধির দুর্নিবার প্রকাশ প্রায়ই দেখা যায়। আসলে তা ঠিক নয়। যে যত বড় পণ্ডিত বা জ্ঞানী হবেন তিনি তত বিনয়ী ও নিরহংকারী হবেন। তাই বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিনয়-ভদ্রতা ইত্যাদি সব কিছু মিলে মানব-চরিত্রের ও মানব-চিন্তের যে প্রকৃত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তাকেই শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ বা আদব-কায়দা বলা যেতে পারে। সব অবস্থাতেই অন্যের সুবিধা, মতামত ও অনুভূতিকে সম্মান করে চলাই শিষ্টাচারের লক্ষণ।

আসলে মানুষের কার্যকলাপে, চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে যখন ভদ্রতা এবং শালীনতা প্রকাশ পায় তখন তার মধ্যে শিষ্টাচারের নিদর্শন মেলে। তাই শিষ্টাচার বলতে মানব-চরিত্রের সৌজন্যবোধ, আচার-আচরণ, শালীনতা ও ভদ্রতা ইত্যাদিকে বোঝায়।

একটি সামাজিক গুণ

মানুষ সমাজবান্দ জীব। বহু মানুষের সঙ্গে তাকে বাস করতে হয়। সংসারজীবনে রয়েছে পরিবারের নানা বয়সের সদস্য এবং সংসারের বাইরে মানুষকে মেলামেশা করতে হচ্ছে অগণিত মানুষের সঙ্গে। এভাবে প্রত্যেকটি মানুষ প্রতিনিয়ত অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসছে। তার ফলেই আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, ভাববিনিময়ে, লেনদেনে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে মানুষ। এই পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যদি শিষ্টতা, ভদ্রতা, সৌজন্য ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাহলে অন্যান্যদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মতিতির সৃষ্টি হয়। সুখকর পরিবেশে মানুষ তখন সুন্দর ও আনন্দময় জীবন যাপন করে। শিষ্টাচারের মাধ্যমে পারস্পরিক আচরণে সুষ্ঠু রুচিবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ফলে মানবিক সম্পর্ক সুন্দর ও নিবিড় হয়ে ওঠে। মানুষ তখন একে অন্যের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। এমনি করেই জীবনের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে শিষ্টাচার।

মনে রাখতে হবে শিষ্টাচার একটি সামাজিক গুণ। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অনেক জ্ঞানী-গুণীর আচার-আচরণ শিষ্টাচার মেনে চলে না। তারা হয়তো মনে করেন, সামাজিক প্রতিপত্তি বা সুখ লাভের জন্য সৌজন্যবোধের কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে তা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তা ভুল ধারণা। কারণ শিষ্টাচার সভ্যতার প্রধান লক্ষণ। সমাজের যে ব্যক্তি শিষ্টাচারে অকৃপণ, দেশ জাতি ও সমাজের কাছে তার মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশি। বস্তুত শিষ্টাচার জীবনে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেকাংশেই সহজ করে দেয়। কারণ বর্তমান জটিল বিশ্বে সুখ, প্রতিপত্তি বা সাফল্য কেবল নিজের ওপর নির্ভর করে না।

প্রাথমিক যুগে মানুষ যখন একাকী নিঃসঙ্গ হয়ে বনে বা পাহাড়ের গুহায় বসবাস করত তখন শিষ্টাচারের তেমন প্রয়োজন হয়নি। যে মুহূর্ত থেকে দলবান্দ হয়ে মানুষ বাস করতে শুরু করে তখন থেকেই শিষ্টাচারের মূল্য অনুভব

রচনা সম্ভার

করতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিচিত লোকের সংস্পর্শে আসার দরকার হয় বলে তখন থেকেই সৌজন্য প্রকাশ জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ অশিষ্ট আচরণ অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করে বলে ব্যক্তিগত গুণ বা সামাজিক মর্যাদা কোনোটাই লাভ করা যায় না। তাই সমাজ-জীবনে শিষ্টাচার অপরিহার্য।

প্রকৃত শিষ্টাচার


অনেকের এমন একটা ধারণা আছে যে শিষ্টাচার এবং তোষামোদি একই কথা। কিন্তু এটা সত্য নয়। শিষ্টাচারের বড় বৈশিষ্ট্য হল তা জ্ঞান ও সত্যের পরিপন্থি কিছু করে না। অথচ পরের তুষ্টির জন্য নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেয় তোষামোদকারীরা। আর শিষ্টাচারী ব্যক্তি যা সত্য, সুন্দর ও জীবনের উপকারে আসে, দৃঢ়চিত্তে তাই সমর্থন করেন। অন্যকে পরিতুষ্ট করার জন্য হীন মানসিকতা তাদের লক্ষ্য নয়।

শিষ্টাচার না থাকার কুফল

শিষ্টাচার না থাকলে মানবজীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ যেখানে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্য ও শ্রদ্ধাবোধ নেই সেখানে কখনও শান্তির মুখ দেখা যায় না। শিষ্টাচারহীন সমাজ অশান্তির আধার। শিষ্টাচার না থাকলে জীবনের কল্যাণকর কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই আমাদের জীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহার

মানুষের পরিচয় নিহিত আছে তার সুন্দর আচার-আচরণে ও তার বিনম্র ব্যবহারে, তার সৌজন্যবোধে, তার ভদ্রতায়। শিষ্টাচারের এসব গুণ মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, পরিশীলিত করে। তার সামাজিক পরিবেশ শান্তিময় করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে সৌজন্যবোধের সঙ্গে সত্য ভাষণের কোনো বিরোধ নেই। তবে সব সত্য সব সময় প্রকাশ করতে শিষ্টাচারের দরকার। তাই অশ্লীলকে অশ্লীল, কানাকে কানা বলা শিষ্টাচারের বাইরে। আমাদের মনে রাখতে হবে শিষ্টাচার এক ধরনের মহত্ত্ব। 

শ্রমের মর্যাদা

ভূমিকা

কর্মই জীবন। কর্মের মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। জীবনের এই কর্মমুখরতা প্রকাশ করতে মানুষকে শ্রম দিতে হয়। শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ তার কর্মময় জীবনে সফলতা অর্জন করে। জীবনের বৈশিষ্ট্য ও জীবিকার বৈচিত্র্যের কারণে শ্রমদান পদ্ধতিও বিচিত্রধর্মী। এই পার্থিব জগতে মানুষকে কাজের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে হয়। কর্মময় এই বিচিত্র জীবনের কর্মপদ্ধতিও বিচিত্র ধরনের। আর তাই পরিশ্রমও নানা-ভাবে করতে হয়। কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেউ শারীরিক পরিশ্রম করে, আবার কেউ বা করে মানসিক পরিশ্রম।

সামাজিক অবস্থা এবং বৈষম্যের কারণে আমাদের দেশে শ্রমের মর্যাদা ঠিকমতো দেওয়া হয় না। উঁচু-নিচু, বড়লোক, গরিবলোক, অনভিজাত-অভিজাত ইত্যাদি ব্যবধান সমাজে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করেছে। এ জন্যে শ্রমের মর্যাদাও জটিল হয়ে পড়েছে।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। আর এই জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রধান এবং অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে পরিশ্রম। তাই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করলে সাফল্য লাভে আনন্দ পাওয়া যায়। এর মতো পরম আনন্দ আর অন্য কিছুতেই পাওয়া যায় না।

বিশ্বের বিরাট কর্মশালায় জীবন নিয়ে আমাদের প্রবেশ করতে হয়। যত বেশি পরিশ্রম করা যায় তত বেশি লাভবান হওয়া যায়। এই পৃথিবীতে সকল মানুষের কমবেশি আরাম ও বিলাসিতার প্রতি দুর্বলতা দেখা যায়। সেগুলো কাটিয়ে উঠতে না পারলে জীবনে সাফল্য আসে না। দারিদ্র্যের অশ্বকারে এবং হতাশায় তখন ডুবে যেতে হয়। তাই তখন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। নিরন্তর পরিশ্রম করলে দারিদ্র্যের কালো মেঘ সরে যায়। জীবনে সফলতা আসে। এ পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রম করেছে সে জাতি তত বেশি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। তারা সকলেই কঠোর পরিশ্রম করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের দিকে তাকালে এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই।

শ্রমের গুরুত্ব

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য কিংবা পরের জন্য পরিশ্রম করতে চায় না, সে আল্লাহুতায়ালার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত। কথায় বলে পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। মানবজীবনে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, সভ্যতার যে বিকাশ এবং বিস্তৃতি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে পরিশ্রম। মানুষ পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বলেই জীবনে সুখের মুখ দেখে। মানুষ শ্রম দেয় বলেই সভ্যতার চাকা ঘোরে। তাই পরিশ্রম দেশ ও জাতি তথা বিশ্বের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। আর যদি প্রত্যেক মানুষকে যথাযথভাবে তার শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হয় তা হলে তার কাছ থেকে অবদানও বেশি পাওয়া যাবে এবং মানুষের জীবন হয়ে উঠবে শান্তিময়।

শ্রম সম্পর্কে মনোভাব

বর্তমানে শ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবতে গেলে বিষয়টি নৈরাশ্যজনক মনে হয়। নিজের কাজ নিজে করলে আত্মসম্মানের হানি ঘটে। আমাদের অনেকের মধ্যে এ রকম ধারণা আছে। কিন্তু এই ভুল ধারণা আমাদের সমাজ-জীবনে যে কত ক্ষতিসাধন করেছে তা বলে শেষ করা যায় না। কায়িক পরিশ্রম মোটেই আত্মসম্মানের ক্ষেত্রে হানিকর নয়। বরং তা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রধান উপায়। জগতের সমস্ত কাজকর্মই শ্রমনির্ভর। অতএব বলা যায়, পরিশ্রম আমাদের সার্বিক উন্নতিবিধানে সহায়তা করে এবং শ্রমহীনতা আমাদের অবনতির অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়।

রচনা সম্ভার

জীবনে উন্নতির জন্য শ্রম

মানসিক উন্নতি বিধান কখনও পরিশ্রম ছাড়া সম্ভব হয় না। কথায় বলে, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ তার মনে কখনও সং চিন্তা ও সম্প্রবেৰ উদয় হয় না। বরং কুচিন্তার কুৎসিত আশ্রয়স্থল হয়ে পড়ে। সাহিত্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতির অধ্যয়ন ও আলোচনার দ্বারা মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু পরিশ্রম না করলে আমরা এ-সব বিষয় আয়ত্ত করতে পারি না। তাই পরিশ্রমের কষ্টপাথরে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করা যায়।

এই পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশি উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলত মানবজাতির স্থিতি ও পরিপূষ্টির মূলে রয়েছে পরিশ্রম। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব কয়েম করছে।

মুসলিমগণ এক সময় পৃথিবী জুড়ে সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেছিল। যতদিন তারা শ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে ততদিন বিশ্বে তাদের মর্যাদা ছিল। কিন্তু যখন থেকে তারা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে শ্রমবিমুখ হয়ে উঠল, তখন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে পড়াশুনার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কলকারখানায় সাধারণ মজুরের, গৃহে গৃহভৃত্যের, অফিস-আদালত-হাসপাতালে সাধারণ বেয়ারার বা কর্মচারীর কাজ করে। এতে তাদের মনে কোনো অমর্যাদার গ্লানি আসে না। আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিঙ্কন সাধারণ কার্টুরিয়া ছিলেন। ইংল্যান্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী র্যামজ ম্যাকডোনাল্ডও ছিলেন সাধারণ শ্রমজীবী। ভারতের অনেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নিতান্তই সাধারণ ঘর থেকে এসেছেন। শ্রীলংকার একজন প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় মুচি। এতে তাদের বিন্দুমাত্র মর্যাদাহানি হয়নি। পরিশ্রম করেই তাঁরা এত উঁচুতে উঠেছেন।

পরিশ্রম না করে পরিনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই সত্যিকারের অমর্যাদা। আমাদের দেশের যুবকেরা সামান্য চাকরির জন্য আত্মমর্যাদা ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে লজ্জাবোধ করে। সেজন্য তারা সারাজীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। কখনও বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা রাজনীতিবিদ হতে পারে না। আমাদের এই সমাজে এক শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় তারা ছোটখাটো কাজকর্মে, এমনকি নিজের গৃহের কাজ করতেও লজ্জা পায়। তারা মিথ্যা ও লোকনিন্দা বা পরিহাসকে অযথা মূল্য দেয়। ফলে তারা পদে পদে বিপদের সম্মুখীন হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে।

উপসংহার

সারা বিশ্বে বর্তমানে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে। শ্রমিকদের জাগরণের ফলে শ্রমের মর্যাদা নতুন করে স্বীকৃত হয়েছে। এখন আমাদেরও শ্রমের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কারণ যে জাতি শ্রমের মর্যাদা দিতে জানে না, সে জাতি পৃথিবীতে কখনও সম্মানজনক আসন লাভ করতে পারে না।

শৃঙ্খলাবোধ

ভূমিকা

শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনের জন্য এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। শৃঙ্খলাবোধ মানুষকে জীবনের সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। মানুষের জীবনের ঈঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রয়োজন শৃঙ্খলার। সমাজ-জীবনকে সুন্দর, শান্তিময় ও সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন মানুষ।

শৃঙ্খলা এবং তার বৈশিষ্ট্য

যে বিধি-বিধানের অনুগত থাকলে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিকভাবে সুষ্ঠু জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে তাকেই শৃঙ্খলা বলা হয়। অর্থাৎ শৃঙ্খলা বলতে নিয়ম-কানুন, বিধিনিষেধের প্রতি আনুগত্য ও তা অনুসরণ করা বোঝায়। আর শৃঙ্খলার প্রতি সচেতনতাই শৃঙ্খলাবোধ। সুন্দর ও পরিপূর্ণ মানবজীবন সুনিয়ন্ত্রিত বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আঁটে-পৃষ্ঠে বাঁধা। আর এই বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করলে তাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলে।

জীবনের সুন্দর বিকাশ মানুষের কাম্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের যা কিছু আইন-কানুন তার সবই জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য। ধর্মীয় নিয়ম-নীতি জীবনকে কল্যাণের এবং ন্যায়ের মহত্তর পথে পরিচালিত করে। সবকিছুর লক্ষ্যই হল মানুষের জীবন শৃঙ্খলার মধ্যে সমৃদ্ধ করা। জীবন সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হলে জীবনের সার্বিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এসব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলাই শৃঙ্খলাবোধ। অর্থাৎ সব রকমের নিয়ম-রীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই শৃঙ্খলাবোধ।

বিধি-বিধান এবং পরিবেশ

ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি। ব্যক্তির সুষ্ঠু আত্মবিকাশেই সমষ্টির বিকাশ। কেউ কেউ মনে করে, সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ইচ্ছেমতো আচরণ করার জন্য। এই ধারণা যারা পোষণ করে তাদের সুষ্ঠু বিকাশ তো দূরের কথা অচিরেই তারা বিপথগামী হয় এবং তাদের জীবনে করুণ পরিণতি নেমে আসে। কারণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরই সে একটা পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হয়। এই পরিবেশের রয়েছে কতকগুলো বিধি-বিধান। সে বিধি-নিষেধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হবে। এ সামঞ্জস্যের মধ্যে শিক্ষা লাভ হবে। মানবচরিত্রের বিকাশ ঘটবে।

নিয়মের রাজ্যে নিয়ম মানা

প্রকৃতির রাজ্য নিয়মের রাজ্য। সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে নিয়মশৃঙ্খলা। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব আকাশে দেখা যায়। সন্ধ্যায় পশ্চিমের আকাশে অস্ত যায়। ষড়ঋতু পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। দিনের পর রাত্রি আসে। উঁচু জায়গা থেকে নিচে জলধারা নেমে আসে। গাছের ফল মাটিতে পড়ে। প্রকৃতির নিয়মেই লৌহখণ্ড জলে ডুবে যায়। আবার লোহা দিয়ে তৈরি বিরাট জাহাজ জলে ভাসে। সুতরাং প্রকৃতির এই রাজ্যের অধিবাসী হয়ে মানুষকেও নিয়ম মেনে চলতে হবে। আর নিয়ম না মানলে অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিতা করলে নিজের অকল্যাণ হবে।

রচনা সম্ভার

নিয়ম সর্বত্র

আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে ধারাটি চলে আসছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছে। মানুষ যাতে মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে, সে কারণে নিজেরাই কতকগুলো বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানূনের ব্যবস্থা করেছে। নিজের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্যই মানুষ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গঠন করেছে। আর এই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ মেনেই জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে যেতে হবে। যদি কেউ মনে করে এই বিধিনিষেধ তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেছে তবে তা ভুল ভাবা হবে। মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা মানে স্বৈচ্ছাচারিতা নয়। এই স্বৈচ্ছাচারিতায় নিজের কোনো কল্যাণ নেই, বরং বিপদ ডেকে আনে। সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একটুও বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হয় না। কারণ শৃঙ্খলার কাজ সহজেই সুসম্পন্ন হয়। বিশৃঙ্খলায় বিপদ ও মৃত্যু ডেকে আনে।


মানুষের জীবনটাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সব সময়ই মানুষকে কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে, মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এই কুপ্রবৃত্তিকে জয় করতে হলে সুপ্রবৃত্তি সৃষ্টিভাবে অনুশীলনের প্রয়োজন। শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মনিষ্ঠ না হলে সৃষ্টিভাবে কোনো কিছু অনুসরণ সম্ভব নয়।

উপসংহার

সৃষ্টিভাবে অনুশীলন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। জন্ম থেকে আরম্ভ করে কর্মজীবনের পূর্বে যে সময়, তাকে আমরা ছাত্রজীবন বলতে পারি। এই সময় শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠার অনুশীলন যদি ঠিক-মতো করা না হয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে নিয়ম-নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা করা হত গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে। আজ সে পরিবেশ নেই বলে শৃঙ্খলার গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। শিশুটি যখন পরিবারের মধ্যে লালিত-পালিত হয় তখন তার মধ্যে নিয়মরীতির প্রতি আনুগত্য এবং শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করবে পরিবারের লোকজন। তারপর যখন সে পাঠশালা, স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করবে তখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নিষ্ঠার অধীনে থাকতে হবে। শিক্ষকগণ নিয়ম-নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেবেন। আবার যখন সে কোনো ক্লাবে বা সংঘের সভ্য হবে সেখানেও তাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

কর্মজীবনেও তাকে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে চলতে হবে। অন্যথায় তাকে বিপদে পড়তে হবে। চাকরিচ্যুতিরও আশঙ্কা আছে।

সুতরাং শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নিয়মনিষ্ঠ হলেই মানুষ তার কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে। আর এই ধরনের ব্যক্তি যদি সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে এগিয়ে আসে তা হলে সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠবে। 

সময়ানুবর্তিতা

ভূমিকা

মানবজীবনকে সফল করে তোলার জন্য চরিত্রের যে গুণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল সময়ানুবর্তিতা। মানবজীবন অর্থবহ করে তোলার অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে সময়ানুবর্তিতাকে বিবেচনা করা যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশ্রম করে মানুষকে সাফল্যের ফসল তুলতে হয়। প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্যও প্রয়োজন সময়ের। যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োগের সব চেয়ে উত্তম সুযোগ ঘটে যথাসময়েই। আমাদের মনে রাখতে হয় সময়ের কাজ সময়ই করতে হবে। তাই সময়ের অনুবর্তী হতে পারলেই জীবনকে সফল করা সম্ভব।

সময়ানুবর্তিতার সংজ্ঞা

সাধারণত সময়ানুবর্তিতা বলতে ঠিক সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার উদ্যোগকে বোঝায়। প্রত্যেকটি কাজের জন্যই নির্দিষ্ট সময় আছে। সে-কাজ শেষ করার জন্য সেই সময়কে কাজে লাগালেই সময়ানুবর্তিতা রক্ষিত হয়।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের ধারা ক্রমাগত চলছে। সৃষ্টি লয় না পাওয়া পর্যন্ত এমনি অব্যাহত গতিতে সময় চলতে থাকবে। এই সময়ের গতিধারায় মানবজীবন খুব অল্প সময়ের অধিকারী। প্রাপ্ত সময়টুকু যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মধ্যেই সময়ানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য নিহিত। যে কাজের জন্য যতটুকু সময় নির্ধারিত সেই কাজ সেই সময়ের মধ্যে করাকেই সময়ানুবর্তিতা বলে।

সময়ানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ তার স্বল্পকালীন জীবনে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে। মানুষের জীবন অত্যন্ত সীমিত সময়ের জন্য। সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাকে অনেক কাজ করতে হয়। এ জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কর্মে নিয়োগ না করলে মানুষকে বহুকর্মই অসম্পূর্ণ রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই তার ওপর অসংখ্য কর্তব্য এসে পড়ে। এই সব কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। তাই নির্দিষ্ট কর্তব্য শেষ না করলে তার জীবনের বহু কর্মই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেজন্য জীবনের এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে সমস্ত সময়কে কর্মে যথাযথ নিয়োগ করাই সকলের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। অনেকে মনে করেন, অনেক সময় হাতে আছে। কাজটি পরে এক সময় করলেই চলবে। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। মনে রাখতে হবে মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তেই কোনো না কোনো কাজ থাকে। প্রত্যেকটি কাজ পরবর্তী কোনো সময়ে করার জন্য ফেলে রাখলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। কথায় আছে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়েও শেষ হয় না।

সময় সচেতনতা


সময় অত্যন্ত চঞ্চল। এটা ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার কাঁটা ধরে খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এটা এক মুহূর্তেও থেমে থাকে না। পেছন থেকে অনুনয়-বিনয় করলেও ফিরে আসে না। অর্থ নষ্ট হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে তা আবার অর্জন করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে ওষুধ খেয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময় একবার চলে গেলে

রচনা সম্ভার

তাকে শত চেষ্টা করেও ফিরিয়ে আনা যায় না। অতএব কালক্ষেপণ করা কারো উচিত নয়। সময় অর্থের চেয়ে অনেক মূল্যবান। জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা যেন একটি সোনার আংটি। আর তাতে ঘাটটি হীরকখন্ড বসানো আছে। সামান্য একটা টাকা হারালে আমাদের আফসোসের সীমা থাকে না। অথচ হীরকখন্ডিত সোনার আংটিরূপ সময় নষ্ট করেও আমাদের মনে কোনো অনুশোচনা আসে না। এটাই আমাদের জীবনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার

মানুষ তার স্বল্পকালীন জীবনে অবহেলায়, উপেক্ষায়, নির্বুদ্ধিতায় সময়ের অনেক অপচয় করে। ফলে ব্যক্তির যোগ্যতার অপচয় ঘটে। জীবন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন হয়ে ওঠে পরাজিত জীবন। মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে। জীবনে কোনো সুফল আনতে পারে না। জাতীয় জীবনেও অবদান রাখতে পারে না। ফলে জাতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

তাই মানুষকে সময়ানুবর্তী হতে হবে। আর মানুষকে সময়ানুবর্তী হতে হলে তার কর্তব্যনিষ্ঠার যথাযথ পরিচয় দিতে হবে। সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। সময়ের কাজ সময়মতো করার মন-মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তা হলেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব। মনে রাখতে হবে, সময়ের আর এক নাম সম্পদ। 

সত্যবাদিতা

ভূমিকা

মানুষকে মহৎ, পুণ্যবান এবং আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলে যে-সমস্ত গুণের দরকার, সততা বা সত্যবাদিতা তার মধ্যে অন্যতম। সত্যবাদিতা মানুষকে মনুষ্যত্বের অধিকারী করে তোলে। সত্যবাদিতা এমন একটি মহৎগুণ যা অন্যান্য গুণাবলির ওপর গুরুত্ব পেতে পারে। সত্যবাদিতা মানুষকে নিয়ে যায় সম্মানের স্থানে। পৌঁছে দেয় গৌরবের চরম শীর্ষে। মানুষকে মানুষের কাছে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে এই সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতা মানব-চরিত্রের অহঙ্কার এবং অলঙ্কার। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাই বলেছেন- ‘তোমাদের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্রে উত্তম, সে আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়।’

সত্যবাদিতার বৈশিষ্ট্য

সৎ থাকার গুণকে সত্যবাদিতা বলে। সত্যকে অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করাকেই সত্যবাদিতা বলে। অসৎ ও অবৈধ কাজকর্ম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে কাজ করাকেই সৎ জীবনযাপন বলে। তখনই মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় সত্যবাদিতা। খারাপ কাজ এবং মিথ্যাচার থেকে দূরে থাকাই সত্যবাদিতা।

যে ব্যক্তির মধ্যে সততা বা সত্যবাদিতা আছে মানুষ তার প্রশংসা করে। তার সৎ কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে শ্রদ্ধা করে। বিবেকবান মানুষ হিসেবে সে সকলের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। সত্যবাদী ছিলেন বলেই আরববাসীরা হযরত মুহাম্মাদকে (সা.) বলতেন ‘আল আমীন’।

দৈনন্দিন জীবন ও সত্যবাদিতা

জন্মগ্রহণের পর থেকেই মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে বড় হতে হয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। তার সামনে আসে অনেক জটিল মুহূর্ত, অনেক বাধা-বিপত্তি। আসে নানা রকম লোভ-লালসা, প্রলোভন। মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে সেসব জয় করেই তাকে এগিয়ে যেতে হয়। উত্তম মানুষ হতে হলে এসব লোভ-লালসা পেছনে ফেলে তাকে সত্যবাদিতার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করতে হয়। অসৎ হওয়া মানেই সততা বা সত্যবাদিতা থেকে বিচ্যুত হওয়া। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, লোভ ইত্যাদি সত্যবাদিতা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে-জন্য সুশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

সত্যবাদিতার অভাবের পরিণাম

সত্যবাদিতা থেকে মানুষ তখনই বিচ্যুত হয় যখন তার নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। মানুষ তখন নানা ধরনের অন্যায় ও অনাচার করতে থাকে। সে তখন পাপের মধ্যে ডুবে যায়। সত্যবাদিতার অভাবে মনুষ্যত্ব লুপ্ত হয়। সমাজে দেখা দেয় নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা। সমাজ এসে দাঁড়ায় ধ্বংসের মুখোমুখি। অসততা বা মিথ্যাচার দেশ ও জাতিকে ছেয়ে ফেলে।

সত্যবাদিতার প্রয়োজনীয়তা


দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই অন্যায়, অনাচার, অবৈধ এবং অসৎ কাজকর্ম দূর করা উচিত। কারণ এই সব খারাপ কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তারা বিবেকহীন হয়ে পড়ে। তারা সত্যবাদিতা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। দেশ ও জাতি তখন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তবে দেশ ও সমাজকে কলুষমুক্ত করতে হলে সততা বা সত্যবাদিতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রায় প্রতিটি ধর্মেই সততা বা সত্যবাদিতাকে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে সততা বা সত্যবাদিতার চর্চা অপরিহার্য।

সত্যবাদিতার উপায়

জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে সত্যবাদিতার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এই জীবনে সত্যবাদিতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সারাজীবন সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে থাকতে হবে। এই সত্যবাদিতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া মানেই বিবেকবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া। ন্যায় ও আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

সত্যবাদিতার শিক্ষা পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যরা শিশুকে সততার পাঠ দেবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এর শিক্ষা এবং চর্চা থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রেও এই সত্যবাদিতার আদর্শ ঠিকমতো রাখতে হবে। আর সত্যবাদিতার বিরোধী কাজের জন্য শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

উপসংহার

আমাদের জীবনের চারপাশে লোভ-লালসা, অন্যায়-অনাচার বিরাজ করছে। তা থেকে মুক্ত হয়ে সততা বা সত্যবাদিতার মধ্য দিয়ে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমরা জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারব। আমাদের প্রত্যেকের ব্রত এই হওয়া উচিত। 

দেশপ্রেম

ভূমিকা

আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্বদেশ বা জন্মভূমিকে জননীর মতো গরীয়সী বলে বর্ণনা করেছেন। জননীর রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা যেমন সন্তানের দেহের অণু-পরমাণুর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে, তেমনি মানবদেহের কোষে কোষে মিশে আছে স্বদেশের তথা জন্মভূমির রূপ-রস, আলো-বাতাস। জন্মভূমি আমাদেরকে বক্ষে ধারণ করে ধন্য করেছে। আলো বাতাস দিয়ে তিল তিল করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে এবং তার রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে আমাদের পরিতৃপ্ত করেছে। এমন স্বদেশের প্রতি যার অনুরাগ নেই, এমন স্বদেশকে যে ভালোবেসে নিজেকে ধন্য মনে করে না, মানবসংসারে তার মতো পাষাণ নেই। অথচ এই স্বদেশের জন্য মানুষ নিজের জীবনও বিসর্জন দেয়। আমাদের একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ তারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে বলে গেছেন – ‘ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।’

স্বদেশ প্রেমের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের মহৎ গুণগুলোর মধ্যে স্বদেশপ্রেম অন্যতম। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যেখানকার আলো-বাতাসে তার জীবন বিকশিত হয়ে উঠেছে তার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা বা অনুরাগের নামই স্বদেশপ্রেম। নিজের দেশকে ভালোবাসাই স্বদেশপ্রেম।

বর্তমানে মানুষ পৃথিবীর অধিবাসী হলেও নির্দিষ্ট ভূখন্ডের মধ্যে তার জীবন আবর্তিত হয়। একটি বিশেষ দেশে, বিশেষ অঞ্চলে মাতৃগর্ভ থেকে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং সেই দেশ ও অঞ্চলের পরিবেশে সে লালিত-পালিত হয়। জন্মভূমি এবং এই জন্মভূমির আলো-বাতাস তার জীবন গঠনে সাহায্য করে। এর মাটির সঙ্গে তার প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে মাতৃভূমির প্রতি তার মমত্ববোধ জাগে। দেশের প্রতি এই মমত্ববোধই স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেম স্বাভাবিক ধর্ম

জন্মভূমির প্রতি, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বদেশকে মানুষ বিনা শিক্ষায়, বিনা প্ররোচনায় ভালোবাসে। স্বদেশের প্রতি তার একটা মায়া পড়ে যায়। সে যদি প্রয়োজনে অন্য কোথাও চলে যেতে বাধ্য হয়, তবু তার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ কমে না। স্বদেশের স্মৃতি সে ভোলে না বরং দূরে গেলে দেশকে তার আরো বেশি করে মনে পড়ে।

সকলের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা তা শুধু একটা গ্রাম বা নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সমগ্র দেশটিকে আচ্ছন্ন করেই আমাদের সেই ভালোবাসা বিরাজ করে। তাই স্বদেশের শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য, নর-নারী, আচার-অনুষ্ঠান, আলো-বাতাস, মানুষ-সবকিছুকে আমরা ভালোবাসি। দেশের সব কিছুকেই আমাদের আত্মীয় বলে মনে হয়।

স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ

স্বদেশের প্রতি যার ভালোবাসা আছে, সে স্বদেশের গৌরবে গর্ববোধ করে। স্বদেশের অবনতিতে দেশপ্রেমিক ব্যথিত হয়, স্বদেশের অপমান-লাঞ্ছনায় সে হয় উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। দেশপ্রেমিক সব সময় স্বদেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় মনে করেন। স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় মানুষ যুগে যুগে যে স্বার্থ ত্যাগ করেছে, দুঃখবরণ করেছে, নির্যাতন-লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিয়েছে, ইতিহাসে তার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। স্বদেশের সম্মান, স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করার জন্য কত মানুষ যে হাসতে হাসতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তা কি আমরা জানি? ‘যেমন ১৯৭১ সালে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ জীবন দান করেছেন, তা দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা জীবন দান করে শহীদ হয়েছেন। তাঁদের দেশপ্রেম আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার এবং অনুসরণীয়।’


প্রত্যেক মানুষেরই স্বদেশপ্রেম থাকা উচিত। ইসলাম ধর্মে স্বদেশপ্রেমকে ঈমান বা ধর্মবিশ্বাসের অংশ বলে মনে করা হয়। স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করে যিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি শহীদের সম্মান পান। স্বদেশপ্রেমের কথা সব ধর্মেই বলা হয়েছে।

শুধু মুখের কথায় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করা যায় না। ‘স্বদেশ তোমাকে আমি ভালোবাসি’— একথার কোনো অর্থ নেই যদি সে স্বদেশের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা না করে, স্বদেশের অপমান ও লাঞ্ছনায় সে যদি উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত না হয়, স্বদেশের পরাধীনতায় সে যদি বেদনাবোধ না করে এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে যদি প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত না হয় তাহলে তার স্বদেশপ্রেম নেই একথা পরিষ্কার।

স্বদেশবাসীর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার পরিচায়ক। স্বদেশের জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিলে স্বদেশপ্রেমের যেমন প্রমাণ দেওয়া হয় তেমনি যে নীরবে-নিভৃতে স্বদেশের গৌরব-মহিমা বৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করে, স্বদেশবাসীর কল্যাণসাধনে যে নিজেকে উৎসর্গ করে, স্বদেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে সচেষ্ট হয়—সে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সৈনিক, বণিক, শ্রমিক, নেতা যাই হোক না কেন, সে স্বদেশপ্রেমিক। তাদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে।

উপসংহার

স্বদেশপ্রেম মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। যার মধ্যে স্বদেশপ্রেম নেই সে শ্রদ্ধেয় ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ নয়। আত্মস্বার্থকেই যে প্রধান করে দেখে, সে দেশপ্রেমিক নয়। দেশ ও জাতির উন্নতি এবং কল্যাণ যে কামনা করে সেই দেশপ্রেমিক। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সততার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের স্বাক্ষর রাখতে হয়। ব্যক্তিস্বার্থের উপরে স্বদেশপ্রেমের স্থান।

এই স্বদেশপ্রেম ক্রমে বিকশিত হয়ে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হয়। নিজের দেশকে, নিজের দেশের মানুষকে ভালোবাসতে পারলে সমস্ত পৃথিবীকে, পৃথিবীর সকল মানুষকে ক্রমে ক্রমে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা জাগে। সুতরাং স্বদেশপ্রেম মানুষকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর ভাবের দিকে পরিচালিত করে। তাই বলা যায় স্বদেশপ্রেম মানুষকে মহৎ করে। 

বৈশাখী মেলা

ভূমিকা

বারো মাসে তের পার্বণ— এই কথাটি আজ বাংলাদেশে প্রবাদের মতো মনে হলেও, এক সময় এই বৃহত্তর বাংলাদেশে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকতো। অর্থাৎ বারো মাস জুড়ে নানা অনুষ্ঠান, নানা উৎসব পালন করা হত। এই

রচনা সম্ভার

সব অনুষ্ঠান আমাদের ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত হত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে এবং আধুনিক জীবনবিন্যাসে ঐ সমস্ত ঐতিহ্য আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

একাত্তরের পূর্বে তৎকালীন শাসকবর্গ নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে নানা ধরনের ঐতিহ্য-উৎসব বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে বাধাপ্রদান করে। একাত্তরে দেশ স্বাধীনের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। নববর্ষ এখন আমাদের জাতীয় উৎসব ও ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বাংলা নববর্ষের দিনটি হলো পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে। সম্রাট আকবরের সময় থেকেই বাংলা নববর্ষ এবং বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ এক তারিখে নববর্ষের সূচনা হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিনটি বাংলাদেশে সরকারি ছুটির দিন।

নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। সারাদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা করা হয়। বৈশাখ মাসের এক তারিখে ব্যবসায়ীরা নতুন করে হিসাবের খাতা খোলেন। তাকে বলা হয় হালখাতা। তারা এই দিনে ক্রেতাসাধারণ, পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মিষ্টিমুখ করান। বাড়ি বাড়ি খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন করা হয়।

তবে এই দিনে ছোট-বড় সকলের কাছে আকর্ষণীয় বৈশাখী মেলা। নববর্ষের শুভ সূচনাকে সামনে রেখে এই মেলার আয়োজন করা হয়। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বত্র এই মেলার আয়োজন করা হয়। নববর্ষকে স্বাগত জানানোর জন্যই এই মেলার আয়োজন। এই মেলা সাধারণত বৈশাখের প্রথম দিনটিতে প্রায় সারাদিন চলে। অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই মেলা চলে। তবে কোনো কোনো স্থানে এই মেলা তিনদিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত চলে।

মেলায় নানান ধরনের জিনিস, বিশেষ করে কুটিরশিল্পজাত জিনিসপত্রের প্রচুর আমদানি হয়। নানা ধরনের দেশি খাবারদাবার যেমন মুড়ি, মুড়কি, চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি সাজের ঘোড়া, ফুল ইত্যাদি তৈরি হয়। বাঁশের তৈরি বাঁশি, কুলা, নকশি পাখা, কাঁথা, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা ইত্যাদি সামগ্রী মেলায় পাওয়া যায়। শহরের মেলায় এসবের পাশাপাশি কলকারখানায় তৈরি নানা বস্তু সামগ্রী কেনা-বেচা হয়।

এই সমস্ত মেলায় দেশীয় খেলাধুলা, দেশীয় সার্কাসেরও আয়োজন থাকে। হাতে ঠেলা চরকি বাজি বা চরকা ঘূর্ণি ইত্যাদিরও দেখা মেলে। এসব ছোট-বড় সকলেই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে।

মেলায় বর্ণনা

আমাদের দেশে সব ধরনের মেলাই পরিকল্পিত আয়োজন। বিশেষ বিশেষ জাতীয় অনুষ্ঠান ও মেলা বিশেষ বিশেষ তারিখে আয়োজন করা হয়। মেলায় বহু মানুষের মিলন হয়। মেলাকে ঘিরে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির সেতু গড়ে ওঠে। বিক্রির জন্য বিচিত্র সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে কোনো স্থানে অনেক মানুষের মিলিত হওয়াই মেলা।

আমাদের দেশে বৈশাখী মেলা এই ধরনের একটি আনন্দ-উৎসব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই মেলায় নানা ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকলেও কুটিরশিল্পের পণ্যসামগ্রী এবং দেশীয় কলকারখানায় তৈরি শিল্পসামগ্রী

প্রাধান্য পায়। দেশীয় খাবার দাবারেরও প্রচুর দোকানপাট থাকে। মেলার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াও শিশুদের জন্য প্রচুর আয়োজন থাকে। মাটির খেলনা, প্লাস্টিকের খেলনা, কাঠের তৈরি নানা ধরনের খেলনা, শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য দোকানপাটে সাজিয়ে রাখা হয়। এই সব দোকানপাট রাস্তার দু ধারে বা খোলা মাঠে আস্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে। বৈশাখী মেলায় সকালবেলা পান্তা ভাত ও ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে।

বৈশাখী মেলার তাৎপর্য

নববর্ষকে কেন্দ্র করে যে বৈশাখী মেলা চলে তাতে বহু লোকের সমাগম হয়। এ যেন বিচিত্র মানুষের মিলনক্ষেত্র। এই মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের তুচ্ছ দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। গ্রামে এই ধরনের মেলা নিস্তরঙ্গ জীবনে আনন্দের ছোঁয়া নিয়ে আসে। গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে ওঠে বৈশাখের এই গ্রামীণ মেলা।

বিভিন্ন শহরেও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের পুরনো ঢাকায় এবং শাহবাগ থেকে শুরু করে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রাস্তার দু পাশে প্রতি বছর বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। আমাদের বেতার-টেলিভিশন ছাড়া তেমন কোনো আনন্দ উপভোগের উপকরণ নেই। নববর্ষের মেলা তাই অগণিত মানুষের সমাগমে আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে। এই জাতীয় উৎসবকে শহরের মানুষ জাতীয় উৎসবের অনুভূতি সহকারে উদ্‌যাপন করে।

উপসংহার

বাংলা নববর্ষ আসে আনন্দের পসরা সাজিয়ে। নববর্ষের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপন করতে গিয়ে নতুন করে বছরকে আহ্বান জানানো হয় মেলার মাধ্যমে। এই মেলায় ফুটে ওঠে অনাবিল আনন্দ। জাতীয় উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বৈশাখী মেলা থেকে আমরা মানুষে মানুষে মিলনের ঐকান্তিকতা খুঁজে পাই। মেলা আমাদের দেশীয় পণ্যকে, দেশীয় ঐতিহ্যকে সকলের সামনে পরিচিত করে তোলে। তাই মেলা ভরে ওঠে আমাদের প্রাণের উল্লাসে।

বনভোজন

ভূমিকা

সাধারণভাবে বনভোজন বলতে বনে বসে ভোজন করা বোঝায়। দলেবলে সবাই মিলে বনে গিয়ে আনন্দ-ফুর্তি উপভোগ করা, গান গাওয়া ও খাওয়া-দাওয়া করাকে বনভোজন বলে। পরিচিত পরিবেশ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে দূরে গাছ-গাছালি পরিবেষ্টিত কোনো মনোরম স্থানে গিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছুটা সময় খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ-ফুর্তি করে কাটানোই বনভোজন।

আমাদের কর্মময় জীবন অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গেই কাটে। আমাদের জীবনে তেমন করে অবসর বিনোদনের সময় নেই, পরিবেশও নেই। তবু বাঁধাধরা একঘেয়ে জীবন থেকে মন মাঝে মধ্যে মুক্তি পেতে চায়। তাই প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে

রচনা সম্ভার

কিছুক্ষণের জন্য মুক্তির আনন্দ ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্য আমরা পরিচিত পরিবেশ থেকে অন্য কোথাও ছুটে যাই। তখন এই কর্মবহুল জীবন কিছুক্ষণের জন্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

বৈশিষ্ট্য

সাধারণত পরিবারের লোকজন, আত্মীয়-স্বজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের লোকজন একত্রিত হয়ে কোনো এক ছুটির দিনে দলবেঁধে অন্যত্র গিয়ে খাওয়া দাওয়া এবং আনন্দ করার নামই বনভোজন। এই বনভোজন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একদিনের জন্য বনভোজনে যাওয়া হয়। তবে বেশি দূরে হলে সময়সীমা বর্ধিত হয়।

আমাদের দেশে বনভোজন করতে নানা পথে নানাভাবে যাওয়া যায়। এখন যাতায়াতের কিছুটা সুবিধা হওয়ায়, রাস্তা-ঘাটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রাস্তাঘাট ভালো হওয়ায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থলপথ বনভোজনে ব্যবহার করা হয়। বাহন হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাসে যাতায়াত করা হয়। কখনও কখনও রেলপথেও যাওয়া হয়। আর নদীমাতৃক এই দেশে নদীপথেও চলাচল করা যায়।

বনভোজনের জন্য এখন বাংলাদেশ জুড়ে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বনভোজনের জন্য ভাওয়ালের গড়, মধুপুরের গড় প্রভৃতি স্থানে কিছু জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ অবস্থানের জন্য গভীর বনের মধ্যে ঘর-বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। পানির ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি লোকের মাধ্যমে তার পরিচালনা করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক স্থানও বনভোজনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মহাস্থানগড়, ময়নামতি, গজনী, সোনারগাঁ এই সমস্ত স্থানের অন্তর্গত। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, কিছু কিছু দ্বীপাঞ্চল এবং খুলনার সুন্দরবনের কিছু কিছু অঞ্চলে অনেকে বনভোজন করতে যায়। সাভার স্মৃতি সৌধেও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দলবেঁধে এসে এর সৌন্দর্য উপভোগ করে এবং সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে।

উপকার

বনভোজনে আমরা একসঙ্গে অনেকে মিলে যেতে পারি। ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বনভোজনে বাড়ির বাইরের ব্যতিক্রমী জীবনকে অনুধাবন করতে পারি। বনভোজনের মাধ্যমে আমরা অনেক বিখ্যাত স্থান পরিদর্শন করতে পারি। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটাতে পারি। উপরন্তু বনভোজনের মাধ্যমেই আমরা পরিচ্ছন্ন আনন্দ লাভ করতে পারি।

একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা

বৃত্তি পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষা শেষে স্কুল থেকে আমরা ক্লাসের ছাত্র সবাই মিলে বনভোজনে যাব বলে স্থির করি। আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে কবির স্যার এই ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ও সিদ্ধান্তে স্থির হল আমরা ঢাকার অদূরে চন্দ্রার বনাঞ্চলে বনভোজন করতে যাব; ঐ জঙ্গলের মধ্যে বনভোজনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। অল্প কয়দিনের মধ্যে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়া বাবদ ছাত্রদের জন্য যে চাঁদা ধরা হয়েছিল, তা সংগৃহীত হল। যাতায়াতের জন্য একটি বাসও ভাড়া করা হল। ঠিক হল শূক্রবার ভোর সাতটায় স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে আমাদের যাত্রা শুরু করব।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা কবির স্যারের নেতৃত্বে সবাই মিলে যাত্রা করি। যাওয়ার সময় বাসের মধ্যেই আমরা এক তরফা নাস্তা করলাম। স্কুটিতে বাসের মধ্যে সবাই হৈচৈ ও আনন্দ করতে লাগলাম। আমি গান জানতাম বলে সবাই আমাকে গান গাইতে বলল। আমি গান শুরু করলাম— ‘আমাদের যাত্রা হল শুরু...। সবাই মিলে আমার সঙ্গে গলা মিলাল।

আমরা গন্তব্যে পৌঁছে আর এক তরফা নাস্তা করলাম। তারপর নির্দিষ্ট স্থানের আশেপাশে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়লাম। উনুত্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। কবির স্যার বাবুর্চির সঙ্গে রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। খাওয়ার সময় তিনি দুপুরের খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। আমরা দল বেঁধে দুপুরের খাবার খেলাম। খাওয়াটাও খুব মজার হল। আমরা আসবার সময় কলার পাতা নিয়ে এসেছিলাম। সেই কলার পাতায় করে খেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও যোরাফেরা করে সবাই কবির স্যারের নির্দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম। যে যা করতে পারে সে তাই করল। কেউ গান গাইল আর কেউ করল আবৃত্তি। কেউবা কৌতুক দেখাল। সব মিলে খুব আনন্দে কাটল।

বিকাল হয়ে এল। সূর্য পশ্চিম প্রান্তে ঢলে পড়েছে। আমাদের বিদায়ের ঘণ্টা বাজল। মন খারাপ করা অনুভূতি নিয়ে সবাই মিলে বাসে চাপলাম। তারপর একসময় স্কুল প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছলাম। আমাদের অনেকেরই অভিভাবক স্কুল প্রাঙ্গণে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে যে আনন্দ উপভোগ করেছিলাম, আমাদের জীবনে তা অক্ষয় হয়ে থাকবে। 

নদীপথে ভ্রমণ

ভূমিকা

কৌতূহল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার আগ্রহ মানুষের চিরকালের। এই আগ্রহের ফলেই মানুষ নিরিবিলা শান্তিপূর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। বিপদসঙ্কুল পথকে সাথি করে মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

জীবন ও প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে বিচিত্র স্থানে বিচরণ করাকেই ভ্রমণ বলে। ভোরবেলা স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বাইরে বের হলে বলে প্রাতঃভ্রমণ। সন্ধ্যায় ঘর থেকে বের হলে বলে সন্ধ্যাভ্রমণ। এভাবে এক দেশ থেকে অন্য আর এক দেশ দেখতে বের হলে বলে দেশভ্রমণ।

রচনা সম্ভার

ভ্রমণের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিচরণশীল। সেকালে পথের বাধা, যানবাহনের অসুবিধা কোনো কিছুই তাদের ঘরের কোণে বন্দি করে রাখতে পারেনি। পায়ে হেঁটেই তারা দেশ থেকে দেশে পরিভ্রমণ করেছে। পদব্রজে ভ্রমণ ছাড়া তখন আর কোনো উপায় ছিল না।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়ার ফলে যাতায়াতের দুর্গম পথ অনেক সুগম হয়েছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্যও নানা ধরনের যানবাহন তৈরি হয়েছে। মানুষ আকাশপথে, স্থলপথে, নদীপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অতি সহজেই ভ্রমণ করতে পারে।

আকাশপথে উড়োজাহাজ বা বিমানে চড়ে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে। বাস, বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বা রেলগাড়িতে স্থলপথেও মানুষ যাতায়াত করছে। আর নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলযানে নদীপথেও মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারছে।

ভ্রমণ মাত্রই আনন্দদায়ক। কিন্তু নদীপথে ভ্রমণে অন্য রকম আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের দেশ এক সময় নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদিতে ভরা ছিল। ধীরে ধীরে নদী দখল হয়েছে। খাল-বিল ভরাট হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও নদীপথ কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বরং আগের মতো এখন মানুষ অনেক স্থানে নদীপথে যাতায়াত করছে। বর্ষামৌসুমে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নদীপথে যাতায়াত করতে হয়। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যাতায়াত এখনও নদীপথে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। চাঁদপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও বেশির ভাগ মানুষ নদীপথে, পরিভ্রমণ করে। এ অঞ্চলের অনেকেই স্থলপথ পছন্দ করে না। ঐ সমস্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা নদীপথেই তাদের জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আনা-নেওয়া করে।

নদীপথে ভ্রমণের আনন্দ

স্থলপথের চেয়ে নদীপথে ভ্রমণ অনেক ক্ষেত্রে সুখকর। নদ-নদীর তীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ভ্রমণ করতে খুব আনন্দ হয়। খুব আয়েসের সঙ্গে নদীপথে চলাফেরা করা যায়। এক সময় এদেশের ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও নদীপথেই চলাচল করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রমণ ছিল নদীপথে। বাংলাদেশে এসে তিনি পদ্মা ও ইছামতি নদীতে পরিভ্রমণ করতেন নৌযানে। তাঁর দুটি নৌকা ছিল-তার একটির নাম ছিল পদ্মা, অন্যটি ইছামতি। এই নদীভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি ‘সমাপ্তি’, ‘ছুটি’ ইত্যাদি ছোটগল্প লিখেছেন।

নদীপথে ভ্রমণের যানবাহন

নদীপথে যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করে তার মধ্যে নৌকা অন্যতম। নৌকায় করেই মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করত। এক সময় বিভিন্ন ধরনের নৌকা ছিল। নৌকার মাঝি দাঁড়ে বসে থাকত। মাল্লারা দাঁড় বাইত। এই নৌকা বাইতে বাইতে যে গান গাইত তা ভাটিয়ালি গান নামে পরিচিত। এই সব গানে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, বিশেষ করে সাধারণ ঘরের দুখিনী নারীদের অন্তর্বেদনার কথা মূর্ত হয়ে ওঠে। গ্রামীণ নারী শূশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করছে। কিন্তু বহু দিন মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা হয় না। তাদের সেই মন খারাপ করা ভাবনা এ সমস্ত গানের মধ্যে প্রকাশ পেত।

ছোট ছোট নৌকাকে বলা হত ডিজি নৌকা। এই সমস্ত নৌকা ছোট ছোট নদী, খাল, বিলে চলাচল করে। নৌকাগুলো হৈওয়ালা অথবা হৈ ছাড়া। এর কোনো কোনোটি একজন মাত্র মাঝি চালায় বলে তাকে এক মান্নাই নৌকা বলে। বড় বড় নৌকা বড় বড় নদীতে যাতায়াত করে। এগুলো দিয়ে দূরে লোক যাতায়াত ও পণ্যসামগ্রী আনা-নেওয়া করে। যাত্রীবাহী বড় নৌকাকে পানসি বলে। অনেক সময় মাঝিরা নদীতীরে নেমে দীর্ঘ দড়ি দিয়ে এ সমস্ত নৌকা টেনে নিয়ে যেত। একে বলে গুণ টানা। নৌকাগুলোতে অনেক সময় টানানো হয় পাল। এই পাল ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বিচিত্র সাজের ও বিচিত্রভাবে চালিত নৌকার নিদর্শন এখনও মিলে। তবে এখন বেশির ভাগ নৌকাই ইঞ্জিনে চলে। সমুদ্রপথে এক ধরনের নৌকা চলাচল করে। তাকে সাম্পান বলে।

নৌকা ছাড়াও বর্তমানে নদীপথে চলাচলের জন্য নানা ধরনের, নানা আকৃতির ছোট-বড় লঞ্চ রয়েছে। ছোট লঞ্চগুলো সাধারণত ছোট নদীপথে ও খালে যাতায়াত করে। নদী পারাপারেও ছোট লঞ্চগুলো ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এই লঞ্চগুলো একতলাবিশিষ্ট। লঞ্চের উপরের ছাদকে বলে ডেক। এই সমস্ত লঞ্চের বেশির ভাগ যাত্রীই ডেকের যাত্রী। লঞ্চ এই ডেকের ভাড়া সব চেয়ে কম। উপরের ছাদে বা ডেকে ছোট একটা কক্ষ আছে। সেখানে বসে সারেং লঞ্চ চালান। এই সারেং এর কক্ষের পেছনে যাত্রীদের জন্য ছোট একটা আরামদায়ক কক্ষ থাকে, তাকে বলে কেবিন।

কোনো কোনো লঞ্চ দোতলা বা তিনতলাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। লঞ্চ ছাড়াও স্টিমার বা জাহাজ নদীপথে বা সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। লঞ্চের তুলনায় সেগুলো অনেক বড়। যে লঞ্চ বা স্টিমার চালায় তাকে বলে সারেং। তবে লঞ্চ বা স্টিমারের মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে নিচে একটি কক্ষে। সেখানে যারা কর্মরত তাদের বলে সুকানি।


মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি প্রবল হলে নদীপথে বিপদের আশঙ্কা থাকে। প্রবল ঝড়ে নৌকা, লঞ্চ বা স্টিমার অনেক সময় ডুবে যায়। অনেক সময় কোনো চড়ায় গিয়ে আটকে পড়ে। মুসলধারে বৃষ্টি হলে সামনের কিছু দেখা যায় না বলে নানা ধরনের বিপদ হয়। অনেক প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। অতিরিক্ত যাত্রী বহনের ফলেও এ ধরনের বিপদ হয়ে থাকে। ত্রুটিপূর্ণ নৌযানের ফলেও নানা বিপদ ঘটে থাকে। প্রায় প্রতি বছরই সচেতনতার অভাবে লঞ্চ, স্টিমার, নৌকা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

নৌপথে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

আমরা গত বৈশাখ মাসে মামার বিয়ে উপলক্ষে নদীপথে লঞ্চ করে চাঁদপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। লঞ্চটি তিনতলা-বিশিষ্ট ছিল। আমরা সদরঘাট থেকে লঞ্চের দোতলা কেবিনের টিকেট কেটে লঞ্চ উঠেছিলাম। যথাসময়ে সকাল আটটায় লঞ্চ ছেড়েছিল। আমি ডেকের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নদী ও নদীতীরের দৃশ্য দেখছিলাম। লঞ্চের পাশাপাশি নদীতে অনেক ছোট-বড় নৌকা যাতায়াত করছিল। সেগুলোকে ছবির মতো মনে হয়েছিল। লঞ্চ চলার সময়ে যে ঢেউ উঠছিল তার আঘাতে নৌকাগুলো দুলাছিল। কখনও কখনও আমাদের লঞ্চের পাশ দিয়ে স্টিমার বা লঞ্চ যাওয়ায় আমাদের লঞ্চও ঢেউ লেগে দুলাছিল। ভয় পেলেও বেশ মজা পেয়েছিলাম। ক্রমে ক্রমে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে বড় নদীতে আমাদের লঞ্চ গিয়ে পড়ে। তখন ঢেউয়ের দোলায় লঞ্চ দুলাতে শুরু করে। চাঁদপুরের কাছাকাছি গেলে নদী আরও বিরাট ও প্রচণ্ড মনে হয়। আসলে ঐ স্থানটি একাধিক নদীর মিলনস্থল। বিস্তৃত জলরাশি, উপরে সুনীল আকাশ দেখতে খুব মনোরম।

রচনা সম্ভার

হঠাৎ দেখলাম আকাশ কালো হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পর সাবধানবাণী শোনা গেল, ঝড় আসছে। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ঝড়ের দু-একটা প্রচণ্ড ঝাপটা লাগল। লঞ্চ প্রচণ্ডভাবে দোল খেল। ডেকের যাত্রীরা হেঁচো ও চিৎকার শুরু করে দিল।

কিছুক্ষণ পর ঝড় থামল। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। লঞ্চ আবার স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। অবশেষে গন্তব্য স্থান চাঁদপুরে পৌঁছলাম। পরের দিন ঐ পথেই আবার ফিরে এলাম। এই অতি অল্প সময়ের জন্য নদীপথে ভ্রমণ করলেও আমার স্মৃতিতে তা অম্লান হয়ে থাকবে। ওই নদীপথে লঞ্চে পরিভ্রমণ আমার জীবনের ভালোলাগার একটি চমৎকার ঘটনা। কোনো দিনই নদীপথে ভ্রমণের এই স্মৃতি আমি ভুলব না। 

একজন কৃষকের আত্মকাহিনী

ভূমিকা

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আমাদের এই দেশ, বাংলাদেশ। এ দেশের উর্বর ভূমিতে যে ফসল উৎপাদিত হয় সেই ফসলই আমাদের প্রধান সম্পদ। এই সম্পদ যারা উৎপাদন করে তারাই বাংলার কৃষক। বাংলাদেশের আটষাট হাজার গ্রামে তাদের বাস। একসময় একটি কথা প্রচলিত ছিল যে আটষাট হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। এই আটষাট হাজার গ্রামবাংলার অসংখ্য কৃষকের মতো আমিও একজন কৃষক। কৃষিকাজ করেই আমার এবং আমার পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগাতে হয়।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার পলাশবাড়ি গ্রামে আমার বাস। আমার বাপ-দাদারাও এই গ্রামে বাস করতেন। শূনেছি গ্রামটি তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আমার পূর্ব-পুরুষদের পুকুর ভরা মাছ ছিল। শস্য ভরা খেত ছিল। গোলা ভরা ধান ছিল। গোয়াল ভরা গরু ছিল। হালের বলদ ছিল কয়েক জোড়া। বাড়ির চৌহদ্দিতে ছিল নানা জাতীয় ফল-ফলাদির গাছ।

বর্তমান অবস্থা

প্রথমে পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জমি-জমা, বাড়ি-ঘর ভাগ হল। তারপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। যমুনা নদীর ভাঙনের করাল গ্রাসে জমি-জমা বাড়ি-ঘর প্রায় সবই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেল। আমরা রাতারাতি প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেলাম। সমৃদ্ধিশালী, সম্পদশালী কৃষক বলে যারা একদিন গর্ব করত, তারা এখন প্রায় হতদরিদ্র হয়ে পড়েছে। আমি সেই দরিদ্র কৃষকেরই একজন।

জীবন-বৃত্তান্ত

আমার এখন মাত্র এক জোড়া বলদ। একটা মাত্র হাল। জমিজমাও অনেক কম। আমাদের যা জমিজমা ছিল প্রথমে বাপ-চাচাদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তারপর আমার বাবার জমি আমার ভাই-বোনদের মধ্যে ভাগ হয়েছে। ভাগে খুব অল্প জমি পড়েছিল। পরবর্তীতে বহু কষ্ট করে কিছু জমি কিনেছিলাম। কিন্তু যমুনার ভাঙনের ফলে তার অনেকটাই নদীগর্ভে চলে গেছে। তাই চাষবাস করে যে ফসল পাই তাতে সারা বছর চলে না। বছরের শেষের দিকে প্রায় মৌসুমে কিনেই খেতে হয়। বাধ্য হয়ে তাই কৃষিকাজের পাশাপাশি অন্য কাজ করতে হয়।

যাদের একদিন জাতির মেরুদণ্ড বলা হত আজ তাদের সে মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। আমার পরিবারের সদস্যসংখ্যা এখন ছয়জন। বড় ছেলে আমার সঙ্গে কৃষিকাজ করে। দ্বিতীয় ছেলেটিকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। মেয়ে দুটিকেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি। এখন বুঝতে শুরু করেছি, শুধু কৃষিকাজ করে আর পরিবার পালন সম্ভব নয়। পড়ালেখা শিখে অন্য কাজ করতে হবে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলালেও আমরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। দুই বেলা ঠিকমতো অনেক সময় খাবার যোগাড় করতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে কোনো কোনো দিন নিজেদের অর্ধাহারে বা উপবাস করে কাটাতে হয়। অথচ আমরা যাদের খাবার যোগাই তারাই আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। চাষা বলে তারা আমাদের গালি দেয়।

বর্তমানে কর্তব্য

আমি একজন কৃষক। আজ আমি বুঝতে পারছি পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ। আমাদের শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ছোট পরিবার রাখা। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদের কাজ হচ্ছে। অথচ আমরা সেই মান্ব্যাতার আমলের রীতিতেই চাষাবাদ করে যাচ্ছি। আমাদের দেশে তার ব্যবহার ও চর্চার প্রয়োজন রয়েছে।

কর্তব্য

কৃষির উন্নয়নে সরকার ও দেশবাসীদের সচেতন হতে হবে। গ্রামের কৃষকদের এখন সমবায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। বুঝতে হবে দেশের লাঠি, একের বোঝা। কারণ আমাদের এখন ছোট ছোট জমি। এই জমিতে ফসল ঠিকমতো উৎপাদন করতে হলে যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষাবাদ করতে হবে। পুরনো দিনের হাল-বলদের পরিবর্তে ট্রাকটর ব্যবহার করতে হবে। আগের তুলনায় জমির উর্বরতাশক্তি অনেক কমে গেছে। তাই জমিতে সার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারকে সারের ব্যবস্থা করতে সচেতন ও তৎপর থাকতে হবে। প্রায়ই সার নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের কেলেঙ্কারির কথা শোনা যায়। ব্যাপকহারে সেচকলের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যুতের অপ্রতুলতা দূর না করলে সেচকল চালানো সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

উপসংহার

আমার মতো দেশে যত দরিদ্র কৃষক রয়েছে তাদের দিকে সকলের, সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখা আবশ্যিক। মনে রাখতে হবে, বাইরে থেকে খাদ্য এনে খাদ্যঘাটতি কখনও পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। যেহেতু আমাদের ভারী শিল্প-কারখানা নেই, তাই এই কৃষির ওপরই নজর দিতে হবে বেশি করে। একজন কৃষক হিসেবে দেশবাসীকে এ কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

পরিশেষে একথাই বলব যে চাষা বলে যতই আমাদের ঘৃণা করা হোক না কেন, আমরা কিন্তু গর্ব অনুভব করি। গর্ব অনুভব করি এই কারণে যে, আমরা চাষ করে ফসল ফলাই বলেই দেশের মানুষ দু বেলা পেটভরে খেতে পায়। সাধারণ মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত ‘চাষী’ কবিতায় তাই বলেছেন :

চাষীকে কেউ চাষা বলে

করিওনা ঘৃণা

বাঁচতাম না আমরা কেহ


এই সে কৃষাণ বিনা।

রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে

ভিজে দিবারাত্রি।

মোদের ক্ষুধার অনু জোগায়

চায় না'ক সে খ্যাতি।

(নজরুল রচনা সম্ভার, সম্পাদনা- আবদুল কাদির) 

স্বাস্থ্যরক্ষায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

ভূমিকা

সুখে জীবন যাপন করতে হলে সব চেয়ে আগে প্রয়োজন স্বাস্থ্য। বলা হয়ে থাকে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এই স্বাস্থ্য বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে থাকা। কোনো রকম অস্বস্তিবোধ না করা। শরীরে কোনো প্রকার রোগ না থাকা, মন খারাপ না থাকা, সুখে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন উপভোগই সুস্থতা। যে এমনভাবে সুস্থ, তারই স্বাস্থ্য ভালো বলে উল্লেখ করা হয়। দেহ ও মনের সুস্থতার মাধ্যমে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করা যায় তার স্বরূপটিকেই স্বাস্থ্য বলা চলে।

স্বাস্থ্য লাভের উপায় ও বৈশিষ্ট্য

মানবজীবনে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি সুস্থ মানুষই ভালো স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। এই স্বাস্থ্য ভালো তথা সুস্থ রাখতে হলে শরীরের প্রতি সচেতন হতে হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুনগুলো বিশেষভাবে জানা দরকার।

বর্তমানে স্কুল-কলেজের শিক্ষাক্রমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিশু জন্মগ্রহণ করার পর শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান দায়িত্ব পরিবার তথা মাতা-পিতার। স্বাস্থ্য কীভাবে রক্ষা করা যায়, স্বাস্থ্য কী করলে ভালো থাকবে, শিশুকে প্রথমে তা মা-বাবাই শেখাবেন। শিশুকে বোঝাতে হবে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রথম খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষার বা ভালো রাখার প্রধান উপায়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার উপায়

স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিজেকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ভোরবেলা উঠে হাতমুখ ভালো করে ধুতে হবে। দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। খাওয়ার পর দাঁত আবার মাজতে হবে। দাঁত অপরিষ্কার থাকলে নষ্ট হতে পারে। পেটও খারাপ হতে পারে। পা পরিষ্কার রাখতে হবে। নিয়মিত গোসল

করতে হবে। গায়ে মাঝে মাঝে সাবান দিতে হবে। ঘুমাবার আগে হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। হাত ও পায়ের নখ নিয়মিত কাটতে হবে। কারণ হাতের নখে ময়লা জমে থাকতে পারে। তা পেটে গেলে অসুখ হতে পারে।


কাপড়-চোপড় যা সে পরবে তা ঠিকমতো না ধুয়ে পরা উচিত নয়। কেননা তাতে নানা রোগ হতে পারে। বিছানা বালিশের চাদর এবং ওয়ার মাঝে মাঝে ধুতে এবং বদলাতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানে শুধু নিজেকে পরিষ্কার রাখা নয়। নিজের এবং তার চারপাশের পরিবেশকেও পরিষ্কার রাখতে হবে। যেখানে সেখানে পায়খানা বা প্রস্রাব করা উচিত নয়। তাতে নানা রকম রোগ ছড়াতে পারে। নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্রাব বা পায়খানা করতে হবে।

বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছপালা থাকলে সেই গাছের পাতা ঝরে পড়লে তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে সে সব এক সঙ্গে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নর্দমা দিয়ে যাতে নিয়মিত ময়লাপানি বের হতে পারে সেজন্য বাড়ির চারপাশের নর্দমা পরিষ্কার করতে হবে। গোসলখানা ও পায়খানা যাতে নোংরা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সার্বিকভাবে নিজের এবং চারপাশের পরিবেশ যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে নানা প্রকার রোগ হতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের সবারই সচেতন হওয়া দরকার।

উপসংহার

আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে। কথাটি হল- যার স্বাস্থ্য আছে, তার আশা আছে, যার আশা আছে তার সব কিছু আছে। তাই এই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের সচেতন থাকা উচিত। আর তা রক্ষার প্রধান ও অন্যতম উপায় হচ্ছে নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। পরিমিত খাবার, বিশুদ্ধ খাবার, শরীর চর্চা ইত্যাদি স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য দরকার আছে। কিন্তু সবার আগে দরকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। নোংরা মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। নোংরা খাবার কেউ খায় না। নোংরা পরিবেশ কারো ভালো লাগে না। তাই নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং অন্যদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতার লক্ষণ। 

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা

মানুষ পশু নয়। জীব হলেও অন্যান্য জীবের চেয়ে ভিন্ন। তার বিবেকবুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞান আছে বলেই তার পরিচয় অন্যরকম। তাকে বলা হয় জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্তব্যজ্ঞান আছে বলেই মানুষ জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। দেশের প্রতি তার কর্তব্য আছে। কর্তব্য আছে সমস্ত জাতির প্রতি। তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে যে মানুষ বাস করে সেই প্রতিবেশীর প্রতিও তার কর্তব্য রয়েছে। উপরন্তু যে পরিবারের মধ্যে সে বসবাস করেছে, যাদের

রচনা সম্ভার

স্নেহ-মায়া ও ভালোবাসার মধ্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেই পরিবারের প্রতিও তার কর্তব্য রয়েছে। যে মানুষের কর্তব্যজ্ঞান নেই, তার জীবন অর্থহীন।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও করণীয়

সাধারণত মানুষ সংসারজীবনে বাস করতে গেলে সে একা বাস করতে পারে না। সে তার দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, প্রমুখের সঙ্গে মিলে যখন বাস করে তখনই সে পরিবারভুক্ত হয়। সেই পরিবারের মধ্যে চাচা-চাচি ছাড়াও আরো অনেকে থাকে।

এই পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে গেলে পরিবারের সকলের প্রতি সকলের কর্তব্য আছে। বিশেষ করে যে কোনো মানুষকে তার বাবা-মা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি কিছু কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়।

পরিবারের সবচেয়ে সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। সেই হিসেবে দাদা-দাদির প্রতি অবশ্যই কর্তব্য রয়েছে। প্রথমত তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন অবশ্যই কর্তব্য। তাদের উপদেশ-নির্দেশ সবসময় পালন করা উচিত। মনে রাখতে হবে, তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে যে কথা বলেন সেগুলো তারা জীবনের কল্যাণের জন্যই বলবেন। কারণ তারা তাদের নাতি-নাতনিদের জন্য কখনও খারাপ চাইবেন না। তাদের সজ্ঞা দিতে হবে। কিছু সময় তাদের সঙ্গে কাটানো অবশ্য কর্তব্য। বয়সের কারণে কখনও কখনও তারা শিশুদের মতো অবুঝ হয়ে যান। সেজন্য তাদের ওপর রাগ না করে তাদের ভালোবাসা দিয়ে মানিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাদের দোয়া আমাদের একান্ত কাম্য।

একটি পরিবারে দাদা-দাদির পরেই মাতা-পিতার স্থান। এই মানবজীবনে মাতা-পিতার প্রতি অবশ্যই কর্তব্য রয়েছে। সাংসারিক বা পারিবারিক জীবনে মানুষকে অনেক রকম দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য। এই কর্তব্যের সঙ্গে অন্য কোনো কর্তব্যের তুলনা হয় না।

মাতাপিতার প্রতি অবহেলা করলে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ থাকে না। সে তখন মানুষ নামের অযোগ্য হয়ে পড়ে। সমাজের মানুষ তাকে সুনজরে দেখে না। তারা তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। সে পশুর চেয়েও অধম বলে বিবেচিত হয়। তাই পরিবারের মধ্যে মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য সচেতনভাবে সকল কিছুর উপরে আলাদাভাবে স্থান দিতে হয়।

মনে রাখতে হবে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের জীবনের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক। সব সময়ই মা-বাবার মনে সন্তানের প্রতি অপরিণীম ভালোবাসা থাকে। তাঁরা সব সময়ই সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। মাতা-পিতা সন্তানের কখনও অমজ্জাল কামনা করেন না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মাতা-পিতা নানাভাবে সন্তানকে বড় হতে সাহায্য করেন। পিতার চেয়ে সন্তানের জন্য মা বেশি কষ্ট করেন বলেই ইসলামধর্মে বলা হয়ে থাকে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত, আর হিন্দুধর্মে পিতাকে সম্মান দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- ‘পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্য।’ সুতরাং সব ধর্মেই পিতা-মাতাকে বিশেষভাবে সম্মান করা হয়েছে। তাই তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য অনস্বীকার্য।

পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোনো প্রকারেই তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা চলবে না। উচ্চস্বরে তাদের সঙ্গে কথা বলাও বারণ। তাদেরকে সাধ্যমতো সেবা-যত্ন করতে হবে। তাছাড়া তারা যে আদেশ-

নির্দেশ করবেন তা বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে। ইসলামধর্মে বলা হয়েছে পিতা মাতার খুশিতে আল্লাহ-তায়ালারও খুশি হন।


অথচ আমাদের দেশে এমন অনেক সম্ভান আছে যারা মা-বাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা তো করেই না বরং অবজ্ঞা ও অবহেলা করে। তাদেরকে থাকা-খাওয়া থেকেও বঞ্চিত করে কেউ কেউ। এই দুঃখী মা-বাবাদের জন্য তাই দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে বৃন্দাশ্রম। এর চেয়ে দুঃখের ও কষ্টের বোধ হয় আর কিছু নেই।

পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে ভাই-বোনেরা। বড় ভাই-বোনদের অবশ্যই সম্মান করতে হবে। তাদের আদেশ-উপদেশ মানতে হবে। তাদের নির্দেশমতো লেখাপড়া করতে হবে। তারাও পরিবারের অন্যান্যদের মতো সকলের ভালো চায়। যদি ছোট ভাই-বোন থাকে তবে তাদের প্রতি সুনজর দিতে হবে। তাদের স্নেহ বা ভালোবাসা দিতে হবে। তাদের আবদার রক্ষা করতে হবে। তাদের সঙ্গে রাগারাগি বা তাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়। বরং বড় ভাইবোনদের ভালোবাসা ও স্নেহ পেলে তারা জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

এ ছাড়াও পরিবারে অন্যান্য সদস্য যদি কেউ থাকে, তাহলে তাদেরকেও শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে কাছে টেনে নিতে হবে। পরিবারের যারা কাজের মানুষ, দারিদ্র্যের কারণে যারা অন্যের বাড়িতে কাজ করতে এসেছে, তাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং তাদের স্নেহ ও আদর দিতে হবে। তারাও পরিবারের একজন। পরিবারে জন্য তাদের অবদানও কিন্তু কম নয়।

শুধু পরিবার নয়, পরিবারের বাইরে প্রতিবেশীদের প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে। তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষ কখনও একা নয়, বিপদে-আপদে পরিবারের পাশাপাশি এই প্রতিবেশীরাই এগিয়ে আসে।

উপসংহার

একজন কৃতী সম্ভান অবশ্যই তার পরিবারের গৌরবের অধিকারী। তার কৃতিত্বের পেছনে পরিবারেরও অবদান থাকে। তাই পরিবারের সকলের প্রতি যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। পরিবারের সকলে যদি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে তা হলে একটি পরিবার সুখী হতে পারে, সুন্দর হতে পারে। 

বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী

ড. মোহাম্মদ ইউনুস

ভূমিকা

নোবেল পুরস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে যে কয়জন বাঙালি বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ড. মোহাম্মদ ইউনুস তাদের মধ্যে একজন। ভারতবর্ষে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তারপর ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন শ্রী অমর্ত্য সেন। আর ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ড. মোহাম্মদ ইউনুস। তিনি লাভ করেন নোবেল শান্তি পুরস্কার।

রচনা সম্ভার

বাংলাদেশের সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের জন্য তথা সারা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের জন্য যে অবদান তিনি রেখেছেন, তার জন্যই তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

পরিচয়

ড. মোহাম্মদ ইউনুস ১৯৪০ সালের ২৮শে জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারি থানার বাটুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হাজী দুলা মিয়া সওদাগর। তিনি গ্রাম থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন স্বর্ণব্যবসায়ী। মাতার নাম সুফিয়া খাতুন। তিনি ছিলেন গৃহিণী।

ড. মোহাম্মদ ইউনুসের লেখাপড়ার হাতেখড়ি গ্রামের স্কুলে। পরে বাবা-মায়ের সঙ্গে চট্টগ্রামে চলে আসার পর লামা বাজার প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। তারপর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সে সময় উনচল্লিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তিনি ১৬ তম হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বয়েজ স্কাউটের সদস্য ছিলেন। স্কাউটের সদস্য হিসেবে তিনি ১৯৫৫ সালে কানাডা যান। ফেব্রুয়ারি পথে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তিনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন।

১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক সম্মানে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে ব্যুরো অব ইকোনমিক্স-এ কর্মজীবন শুরু করেন।

তারপর ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা পড়তে যান। ব্যাভার বিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বিদেশে থেকে তিনি দেশের জন্য ‘বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ‘বাংলাদেশ নিউজলেটার’ পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশ প্লানিং কমিশনে যোগদান করেন। কিন্তু সে কাজ তার ভালো লাগেনি বলে তিনি সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

নতুন উদ্যোগ

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অগণিত মানুষকে তখন অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুমুখো ভোগ করতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের সাধারণ মানুষের দুরবস্থা দেখে ড. মোহাম্মদ ইউনুসের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য এগিয়ে আসেন। তারা এই নিঃসহায় মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারেন তাদের এই দুর্দশার প্রধান কারণ কী।

তারা নিঃস্ব, দরিদ্র। একেবারে সহায়-সম্বলহীন। তাদের মাথা গাঁজার সামান্যতম ঠাঁই থাকলেও জীবিকার তেমন কোনো সংস্থান নেই। তারা দিন আনে দিন খায়। দৈনিক কিছু কাজ-কর্ম করে কোনো রকম তারা নিজেদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহাজনদের কাছ থেকে তারা চড়া সুদে যে টাকা ধার নেয়, সেই টাকা

যথাসময়ে ফেরৎ দিতে পারে না। ফলে মহাজনের হাত থেকে তারা রেহাই পায় না। মহাজনের কাছে তারা সর্বস্ব খোয়ায়।

মানবদরদি

মানুষের এই দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ শুনে ড. মোহাম্মদ ইউনূসের কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। মানবদরদি এই মানুষটির ইচ্ছে করে কিছু করার। তিনি এদের দুঃখ মোচনের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, অর্থনীতির পুথিগতবিদ্যা সকল মানুষকে বেঁচে থাকার বা খেটে খাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। তাই তার অর্থনীতির শিক্ষকতা করতে, ছাত্রদের কাছে তথাকথিত অর্থনীতির গল্প করতে আর ভালো লাগে না। তিনি তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের জোবরা গ্রামকেই অর্থনীতি সম্পর্কে নতুন করে উপস্থাপনার জন্য গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। শুরু হয় তাঁর পুথিগতবিদ্যা ছেড়ে বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার অভিযান।

যাত্রা শুরু

জোবরা গ্রামে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর মায়ের নামে নাম সুফিয়া বেগমের সঙ্গে। সুফিয়া বেগম ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। সুফিয়া বেগম সারা দিন পরিশ্রম করে বাঁশের মোড়া তৈরি করেন। মহাজনের টাকা বুঝিয়ে দিয়ে মোড়া প্রতি রোজগার করেন মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। এইভাবে সুফিয়া বেগম এবং অন্যান্য দরিদ্রজনেরা মহাজনের কাছে অষ্টোপাসের বন্ধনে আটকা ছিল। এমনি তাদের অবস্থা ছিল যে, একই মহাজনের কাছে তারা এদের তৈরিকৃত সামগ্রী স্বল্প ও নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য থাকতেন।

ড. মোহাম্মদ ইউনূস এই সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সুফিয়া বেগমকে একেবারেই সহজ শর্তে অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দেন। কিন্তু সুফিয়া বেগম তা গ্রহণ করতে ইতস্ততবোধ করেন। পরবর্তীতে ড. মোহাম্মদ ইউনূস সহকর্মীদের নিয়ে সুফিয়া বেগমের মতো দরিদ্র ৪২ জনের একটি তালিকা তৈরি করেন। তারা সবাই মহাজনের জাল থেকে বের হয়ে আসতে পারছিলেন না। সুদ আর তস্যসুদ দিতে দিতেই তারা নাজেহাল। ড. ইউনূস নিজের থেকে এ টাকা মহাজনকে ফেরৎ দিয়ে ঐ ৪২ জনকে নিয়ে তার কার্যক্রম শুরু করেন। এটাই ছিল বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের শূভ-সূচনা।


তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত এবং দরিদ্র বলেই ধনিকশ্রেণী অর্থনীতির সুবিধাগুলো ভোগ করে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন অর্থনীতিবিদদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিই তৈরি করেছিল অর্থনৈতিক চিরাচরিত পরিকাঠামো।

গ্রামীণ ব্যাংক ও তার কর্মপদ্ধতি

ড. মোহাম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৯৮৩ সালের নতুন অধ্যাদেশের ফলে আজকের এই নোবেল জয়ী প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম হয়।

উপসংহার

তার পর থেকে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে আসছে; কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র-ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ ইত্যাদি। হাজার হাজার মানুষ এই ঋণ নিয়ে জীবনের ধারাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরেও ড. মোহাম্মদ ইউনূসের এই ঋণপ্রকল্প সাদরে গৃহীত হয়েছে। দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব মানুষকে সাহায্য করার এই মহতী ব্রতই ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে এনে দিয়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার। গ্রামীণ ব্যাংকও হয়েছে এই পুরস্কারের অংশীদার।

ড. মোহাম্মদ ইউনূস আমাদের গর্ব। তাঁর জন্য সমস্ত বাংলাদেশ গর্বিত। 

বাগ্ধারা ও প্রবাদ-প্রবচন

পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার মতো বাংলা ভাষারও নিজস্ব কিছু প্রকাশভঙ্গি আছে। বাংলা ভাষায় মানুষ যখন কথা বলে তখন ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ যে কেবল সাধারণ অর্থ প্রকাশ করে তা নয়, ক্ষেত্রবিশেষে প্রবাদ-প্রবচন হিসেবে কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ কোনো অর্থ প্রকাশ করার জন্যই এগুলো ব্যবহার করা হয়।

ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যখন আভিধানিক অর্থ প্রকাশ না করে ভিন্ন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগ্ধারা বলা হয়। যেমন অরণ্যে রোদন, নদীর পুতুল, এলাহিকাড, বকধার্মিক প্রভৃতি। বাগ্ধারা ব্যবহারের ফলে বাক্য তীক্ষ্ণ ও রসসিক্ত হয়, অনেক সময় বাক্য গভীরতাও লাভ করে।

প্রবাদ-প্রবচন এমন কতকগুলো অর্থপূর্ণ ও উপদেশমূলক বাক্যাংশ বা বাক্য যা লোকসমাজের যাবতীয় সংস্কার, অভ্যাস ও সমস্যার প্রতিফলন ঘটায়। যেমন- দেশের লাঠি একের বোঝা, চোর পালালে বৃষ্টি বাড়ে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনো, এক মাঘে শীত যায় না ইত্যাদি। সমাজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাগ্ধারা বা প্রবাদ-প্রবচনগুলো কখনও গ্রামীণ পরিবেশে থেকে, কখনও আঞ্চলিক পরিবেশ থেকে, কখনও শিষ্ট সমাজ থেকে ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলোর উচ্চারণ ও বানান মূলে যেভাবে ছিল সেভাবেই ব্যবহার করা সমীচীন। যেমন- কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দ কেনে, এক্ষেত্রে ‘কান্দ’ এবং ‘কেনে’ শব্দ দুটি পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। বাগ্ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনগুলো বাংলা ভাষার ঐতিহ্য। এগুলো আমাদের ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, অর্থবহ ও বিচিত্রময় করেছে।

বাগ্ধারা

যে সকল বাগ্ধারা বাংলা ভাষায় প্রচলিত তার কিছু উদাহরণ এবং বাক্যে তার প্রয়োগ দেখানো হল :

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ১. অকালকুম্ভাড (অকেজো) | এমন একজন অকাল-কুম্ভাডকে দায়িত্ব দিলে সব পড় হয়ে যাবে। |
| ২. অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) | বছরে একবারও দেখা পাওয়া যায় না, কী ব্যাপার অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠলে নাকি? |
| ৩. অন্ধা পাওয়া (বিদ্রূপ অর্থে-মৃত্যু) | গণপিটুনিতে চোরের এমনই হাল হয়েছে যে, যে কোনো মুহূর্তে অন্ধা পেতে পারে। |
| ৪. অজমুখ (নিরেট বোকা) | এমন অজমুখের সঙ্গে মকবুল সাহেব মেয়ের বিয়ে দিলেন? |
| ৫. অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) | সাহায্য করলে না ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলে কেন? |
| ৬. অষ্টরম্ভা (কিছুই না পাওয়া) | বড় বড় কথা বলছ, কাজের বেলায় তো অষ্টরম্ভা। |
| ৭. অহিনকুল সম্পর্ক (শত্রুতা) | সম্পত্তির জন্যে ভাইয়ে ভাইয়ে একেবারে অহিনকুল সম্পর্ক। |
| ৮. অকালপক্ব (বয়সের তুলনায় বেশি পাকা) | কেমন অকালপক্ব ছেলেরে বাবা, বড়দের সঙ্গে তর্ক করে। |

৯. অকূল পাথার (মহা বিপদ) অকূল পাথারে পরম করুণাময়ই একমাত্র ভরসা।
১০. অস্থি-চর্মসার (শীর্ণ দেহ) দীর্ঘকাল রোগে ভুগে ছেলেরা অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছে।
১১. অরণ্যে রোদন (বৃথা অনুন্নয়-বিনয়) তার মতো নিষ্ঠুর লোকের কাছে আবেদন করা তো অরণ্যে রোদন করা মাত্র।
১২. অন্নের সংস্থান (জীবিকার উপায়) এত বড় সংসারের অন্নের সংস্থান করা কি একজনের সাধ্যে কুলায়?
১৩. আক্কেলগুড়ুম (স্তম্ভিত হওয়া) এতটুকু ছেলের কথা শুনে আমার তো একেবারে আক্কেল গুড়ুম।
১৪. আঁতিপাঁতি (সব জায়গায়) আঁতিপাঁতি কোথায় হারালাম, আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও পেলাম না।
১৫. আদ্যিকাল (সেকেন্দ্রে) বাবার পরনে সব সময় আদ্যিকালে পোষাক।
১৬. আঁটে-পৃষ্ঠে (সর্বাত্মক) ওরা লোকটিকে এমন করে আঁটে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে কেন?
১৭. আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প) এই আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করলে ঠকবে।
১৮. আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) তোমার কথায় বাজি ধরতে গিয়ে দশ টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হল।
১৯. আকাশকুসুম (অবাস্তব কল্পনা) পুঁজি নেই, ব্যবসায় লাভের স্বপ্ন দেখছ, এতো আকাশকুসুম কল্পনা।
২০. ইতিউত্তি (এদিক ওদিক) লোকটি এমন ইতিউত্তি দেখছে কেন?
২১. ইনিয়ি বিনিয়ি (ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) এমন ইনিয়ি বিনিয়ি কথা বলার কী আছে।
২২. ঈদের চাঁদ (অনেক প্রত্যাশিত বস্তু) হারানো সম্পত্তি ফিরে পেয়ে বাবা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেলেন।
২৩. উভয় সংকট (দুদিকে বিপদ) মা বলেন ডানে যাও বাবা বলেন বাঁয়ে, আমার হয়েছে উভয় সংকট।
২৪. উড়োকথা (গুজব) উড়োকথায় কান দিওনা।
২৫. উঁচু ঘর (স্বচ্ছল পরিবার) মকবুল সাহেব মেয়েকে উঁচু ঘরেই বিয়ে দিয়েছেন।
২৬. উড়নচড়ী (অপব্যয়ী) দোহা সাহেব উড়নচড়ী লোক, না হলে এমন দশা হবে কেন?
২৭. উনপাঁজুরে (শারীরিকভাবে দুর্বল) এমন উনপাঁজুরে লোক দিয়ে একাজ হবে না।
২৮. একাদশে বৃহস্পতি (পরম সৌভাগ্য) তোমার চাকরিতে পদোন্নতি হয়েছে, ছেলের চাকরি হয়েছে—এখন তো তোমার একাদশে বৃহস্পতি।
২৯. একতাই বল (সম্মিলিত শক্তি) একসঙ্গে কাজ করলে সব দুর্বোঁগই এড়ানো যায়; আর একেই বলে একতাই বল।
৩০. ওলট পালট (বিশৃঙ্খলা) বাড়ি বদলানোর সময় সব ওলট পালট হয়ে গেছে, কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না।
৩১. ওজন বুঝে চলা (আত্মসম্মান রক্ষা করা) নিজের ওজন বুঝে চলতে হয়।
৩২. কলুর বলদ (পরের অধীন) কলুর বলদের মতো পরিশ্রম করছি, ভাগ্যে কিছুই জুটল না।
৩৩. কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) হাতে পয়সা নেই, কিন্তু দেখতে কেতাদুরস্ত।
৩৪. কাউজান (উচিত অনুচিত বোধ) এইটুকু ছেলের কাউজান দেখলে অবাক হতে হয়।
৩৫. কাঠের পুতুল (নির্বাক) কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে তামাশা দেখলে, প্রতিবাদ করলে না?
৩৬. খয়ের খাঁ (তোষামোদকারী) প্রচুর অর্থ থাকলে খয়ের খাঁর অভাব হবে না।
৩৭. খোশগল্প (আনন্দের কথাবার্তা) এভাবে খোশগল্পে মেতে থাকলে কি চলবে?

৩৮. গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) গৌরচন্দ্রিকা না করে আসল কথা বলে ফেল।
৩৯. গোপলায় যাওয়া (অধঃপাতে যাওয়া) অসদৃশ্যে পড়ে ছেলেটা গোপলায় গেছে।
৪০. গভীরের চামড়া (বোধশক্তিহীন) তোমার গায়ে কি গভীরের চামড়া যে এত অপমানেও টলছ না?
৪১. গোবেচারি (নিরীহ ও বোকা) সেলিম সাহেব গোবেচারি লোক। তাকে কেন দোষ দেব?
৪২. ঘুণাক্ষর (আভাস ইঙ্গিত) এ কথা তো আমি ঘুণাক্ষরেও বলিনি।
৪৩. ঘোড়ারোগ (সাথের বাইরে) হাজার টাকাও বেতন পাওনা, অথচ পাকা দালানের স্বপ্ন দেখ।
একেই বলে গরিবের ঘোড়ারোগ।
৪৪. চাঁদের হাট (সুখের সংসার) ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে তোমার ঘরে তো চাঁদের হাট বসেছে।
৪৫. নীর পুতুল (অল্পতেই যে ভেঙে পড়ে বা কষ্ট পায়) এ টুকু কষ্ট সহ্য করতে পারলে না। নীর পুতুল নাকি তুমি?
৪৬. ছিচকাঁদুনে (অল্পতেই কান্নাকাটি করা) এখন তো বড় হয়েছ। ছিচকাঁদুনে স্বভাবটা বদলাতে পারলে না?
৪৭. জগাখিচুড়ি (বিশৃঙ্খল) কাপড়-চোপড়গুলো এমন জগাখিচুড়ি না করে একটু গুছিয়ে রাখতে পার না?
৪৮. জমজমাট (সরগরম) বৈঠকখানায় জমজমাট আসর বসেছে।
৪৯. বাঁকের কৈ (দলবন্দ্য) সবার মুখে একই কথা, বাঁকের কই আর কি।
৫০. টনক নড়া (হুঁশ হওয়া) ছেলে যে অসদৃশ্যে মিশছে বুঝতে পারিনি।
এবার ফেল করাতে টনক নড়েছে।
৫১. ঠোঁট কাটা (স্পর্ধাভাষী) কেমন ঠোঁট কাটা ছেলেরে বাবা, গুরুজনকেও ছাড়ে না।
৫২. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) চাকরি পেয়ে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে নাকি? দেখাই পাই না।
৫৩. ঢাকের কাঠি (তোষামোদকারী) বড় সাহেবের ঢাকের কাঠি তুমি, তোমার তো প্রমোশন হবেই।
৫৪. টিমে তেতালা (ধীরগতি) এমন টিমে তেতালায় চললে কাজ শেষ হবে না।
৫৫. তিলে তিলে (একটু একটু করে) এ সম্পত্তি আমি তিলে তিলে গড়ে তুলেছি।
৫৬. থই থই (পরিপূর্ণ) চারদিকে বন্যার পানি থই থই করছে।
৫৭. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) টাকা ছড়ালে দুধের মাছির অভাব হয় না।
৫৮. ধুন্ধুমার (ভুল কাড) কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবেশীদের মধ্যে ধুন্ধুমার বেঁধে গেল।
৫৯. ধোপদুরন্ত (বাবুয়ানি) বিদ্যা নেই, কিন্তু ধোপদুরন্ত চলাফেরা।
৬০. নীর পুতুল (অত্যন্ত আদুরে) এমন পরিশ্রমের কাজ তোমার মতো নীর পুতুলকে দিয়ে সম্ভব নয়।
৬১. নয়নের মণি (পরম আদরের) নাতিটি বুড়োর নয়নের মণি।
৬২. পটের বিবি (বিলাসী ও নিরুদ্যম মেয়ে) পটের বিবি হয়ে বসে থাকলে চলবে না, কাজে হাত দাও।
৬৩. পদ্মপাতার জল (ক্ষণস্থায়ী) মানুষের আয়ু যেন পদ্মপাতার জল।
৬৪. ফুটি-ফাটা (চৌচির হওয়া) খরায় কৃষকের জমি ফুটি-ফাটা হয়ে গেল।

৬৫. বিসমিল্লায় গলদ (প্রথমেই ভুল)

অঙ্কটা বিসমিল্লায় গলদ হল।

৬৬. বুদ্ধির ঢেঁকি (নির্বোধ)

জীবনে কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারলে না,
বুদ্ধির ঢেঁকি হয়েই রইলে।

৬৭. ভিজ়ে বেড়াল (সাধু বেশে অসং লোক)

ওকে চেন না, ভিজ়ে বেড়াল সেজে আছে।

৬৮. মগের মুল্লুক (বিশৃঙ্খল পরিবেশ)

একি মগের মুল্লুক নাকি, যা খুশি তাই করবে।

৬৯. মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ)

কথাগুলো কিন্তু মিছরির ছুরির মতো গায়ে বিঁধলো।

৭০. যক্ষের ধন (কুপণের সম্পদ)

যক্ষের ধনের মতো সর্বস্ব আগলে রাখলে, ভোগ করলে না।

৭১. রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতি)

আমার বাবা বড়ই রাশভারি লোক।

৭২. লঙ্কাকাণ্ড (তুমুল ঝগড়া)

সামান্য বিষয় নিয়ে তোমরা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দিলে।

৭৩. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খল)

আমার জিনিসপত্র সব হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে।

৭৪. ষোল আনা (সম্পূর্ণ)

পরিশ্রমের ষোল আনাই সার্থক হল।

প্রবাদ-প্রবচন

লোকমুখে যে সব প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে তার কিছু উদাহরণ ও পাশাপাশি ভাবার্থ দেওয়া হল :

১. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

বেশি লোভ করলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ে।

২. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ

বেশি ভক্তি দেখালে বুঝতে হবে তার উদ্দেশ্য খারাপ।

৩. আমও গেল ছালাও গেল

লাভ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারানো।

৪. আঞ্জুল ফুলে কলাগাছ

সামান্য অবস্থা থেকে বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া।

৫. আঠারো মাসে বছর

ধীরগতিসম্পন্ন।

৬. ঊনো ভাতে দুনো বল

পরিমিত আহারে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়।

৭. অতি ভাতে রসাতল

অপরিমিত আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

৮. উদোর পিড়ি বুখোর ষাড়ে

একজনের দোষ অন্যের ওপর চাপানো।

৯. উড়ে এসে জুড়ে বসা

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এসে সর্বেসবী হয়ে বসা।

১০. এক টিলে দুই পাখি মারা

একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সফল হওয়া।

১১. এক হাতে তালি বাজে না

এক পক্ষের দোষে বিবাদ হয় না।

১২. ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়

অন্যের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়।

১৩. কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ

কারও সুসময় কারও দুঃসময়।

১৪. কপালের লিখন না যায় খণ্ডন

ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই।

১৫. খাল কেটে কুমির আনা

নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনা।

১৬. গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়

সম্পদের সবটুকুই ভোগ করা।

১৭. গৌরো যোগী ভিখ পায় না

পরিচিত ব্যক্তির গুণের কদর নেই।

১৮. স্বর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকে ।
১৯. ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি চতুর ব্যক্তির প্রতি প্রাপ্য শাস্তির ইজিত ।
২০. চকচক করলেই সোনা হয় না বাইরের রূপই আসল সৌন্দর্য নয় ।
২১. চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে বিপদ কেটে যাওয়ার পর সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় ।
২২. ছোঁড়া কাঁধায় শূন্য লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা সামর্থ্য নেই অথচ প্রাচুর্যের প্রত্যাশা ।
২৩. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সামান্য কাজের জন্য সামান্য পাত্র ।
২৪. জোর যার মুঠুক তার শক্তি থাকলে সব কিছু জয় করা যায় ।
২৫. ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো একজনকে শাসন করে অপরকে সাবধান করা ।
২৬. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে অভ্যাস কখনও বদলায় না ।
২৭. তেলা মাখায় তেল দেওয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যার আছে তাকে আরও দেওয়া ।
২৮. দুই গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো খারাপ জিনিস থাকার চেয়ে না থাকা ভালো ।
২৯. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ পায় ।
৩০. নাই আমার চেয়ে কানা মামা ভালো কিছু না থাকার চেয়ে অল্প থাকা ভালো ।
৩১. নানা মূনির নানা মত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতামত ।
৩২. পাপের ধন প্রায়চিস্তে যায় অসদুপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় ।
৩৩. পাকা ধানে মই দেওয়া প্রায় সমাপ্ত হয়ে যাওয়া কাজ পড় করে দেওয়া ।
৩৪. বৃদ্ধি যার, যশ তার গায়ের জোরের চেয়ে মেধার জোর বেশি ।
৩৫. ভাঙবে তবু মচকাবে না মনের জোর থাকলে সংকল্প টলে না ।
৩৬. মশা মারতে কামান দাগা সামান্য ব্যাপারে বড় আয়োজন ।
৩৭. যেমন কর্ম তেমন ফল যে যেমন কাজ করে তেমন ফল ভোগ করে ।
৩৮. হাটে হাঁড়ি ভাঙা সকলের সামনে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া ।
৩৯. হাতির পাঁচ পা দেখা অহঙ্কারী ব্যক্তির দাস্তিক আচরণ ।
৪০. হায়রে আমড়া কেবল আঁটি আর চামড়া বাইরে চাকচিক্য ভেতরে শূন্যতা ।

পত্র লিখন

‘পত্র’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পাতা, ফলক, চিহ্ন বা স্মারক। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে ব্যক্তিগত খবরাখবর এবং বৈষয়িক কাজকর্মের জন্য লিখিত বিবরণীকে পত্র বলা হয়। মানবমনের কোনো ভাব বা বস্তুব্য নির্দিষ্ট নিয়মে লিখে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিটিকে পত্র বা চিঠি বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ নির্ধারিত আজিকার মাধ্যমে কোনো তত্ত্ব, তথ্য, ভাব-ভাবনা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর যে বাহন তারই নাম চিঠি।

সাধারণত দূরবর্তী বা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পত্র লেখা হয়। তবে স্মারকলিপি অভিনন্দন-পত্র ইত্যাদি উপস্থিত কোনো সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লেখা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই এই পত্র রচনার প্রচলন চলে এসেছে। পত্র রচনা খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেমন দূরের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বন্ধুবের কাছে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়, তেমনি সরকারি ও ব্যবসায়িক অফিসসমূহে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। পত্রগুলো সবসময় সুরূচিপূর্ণ হওয়া উচিত। এলোমেলোভাবে অমার্জিত ভাষায় পত্র লিখলে তাতে প্রাপকের মন তুষ্ট হয় না। অনেক সময় এতে পত্রের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। পত্র রচনাও সেজন্য শিক্ষার অঙ্গ।

পত্র রচনার কতকগুলো সাধারণ নিয়ম আছে; যথাসম্ভব এগুলো পালন করে পত্র লিখতে হয়। পত্র-প্রাপক ও পত্রের বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুসারে একে নিম্নলিখিত সাতভাগে ভাগ করা যায় :

১. ব্যক্তিগত পত্র
২. আবেদন পত্র
৩. নিমন্ত্রণ পত্র
৪. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিত পত্র
৫. দলিল ও চুক্তিপত্র
৬. অভিনন্দনপত্র
৭. স্মারকলিপি

এই সাত প্রকারের পত্রকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. ব্যক্তিগত
২. সামাজিক
৩. ব্যবসায়িক
৪. সরকারি

প্রতিটি পত্রেরই আবার দুটি প্রধান অংশ থাকে। যেমন: ১. পত্রগর্ভ বা অন্তর্ভাগ ২. শিরোনাম বা বহির্ভাগ।

পত্র-গর্ভকে আবার সাতটি অংশে বিভক্ত করা হয়। যেমন: ১. সৃষ্টিকর্তার নাম ২. পত্র লেখকের ঠিকানা ৩. পত্র লেখার তারিখ ৪. সবিনয় সম্ভাষণ ৫. মূল পত্রাংশ ৬. বিদায়জ্ঞাপক বাণী ৭. লেখকের স্বাক্ষর।

ব্যক্তিগত পত্র : দূরের আত্মীয়স্বজনের, বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদের কাছে যে সব চিঠিপত্র লেখা হয় সেগুলোকেই ব্যক্তিগত পত্র বলে। সাধারণত কুশল সংবাদ, সাংসারিক সংবাদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ ব্যক্তিগত পত্রে লেখা হয়। এই সব চিঠিপত্রে প্রেরক তার মনের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে। ব্যক্তিগত পত্র অনেক সময় সাহিত্যের পদমর্যাদা লাভ করে। তাই পত্রসাহিত্য নামে সাহিত্যের একটি আলাদা শাখা আছে।

ব্যক্তিগত পত্র লেখার কতকগুলো বিশেষ নিয়ম আছে। সেসব অবশ্যই জানা দরকার। যেমন :

১. চিঠির মাথার উপর ঠিক মাঝখানে সৃষ্টিকর্তার নাম লেখার নিয়ম আছে। মুসলমানগণ ‘আল্লাহু আকবার’ ‘এলাহি ভরসা’ বা ‘ইয়ারব’ ইত্যাদি এবং হিন্দুগণ ‘ওঁ’, ‘শ্রী শ্রী হরি সহায়’, ‘শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়’, ইত্যাদি লিখে থাকেন। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে এই রীতি অনেক সময় অনুসরণ করা হয় না।
২. চিঠির উপরে ডান কোণে পত্রলেখকের ঠিকানা ও তারিখ লিখতে হয়। এটা খুব জরুরি। কারণ কোন ঠিকানা থেকে, কোন তারিখে পত্রটি লেখা হয়েছে তা জানা প্রাপকের একান্ত প্রয়োজন।
৩. চিঠির বাঁ দিকে শুরুতে প্রাপককে সম্বোধন করা হয়। বয়স ও সম্পর্কভেদে সম্বোধন নানা রকম হয়ে থাকে। গুরুজনকে লেখার সময় মুসলমানগণ ‘পাক জনাবেশু’, ‘মোবারক জনাবেশু’, ‘শ্রদ্ধেয়’, হিন্দুগণ ‘পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু’, ‘শ্রী চরণেশু’ প্রভৃতি সম্বোধন লিখে থাকেন। বন্ধুবান্ধবদের সম্বোধনে লেখা হয় ‘বন্ধুবর’, ‘সুহৃদয়েশু’, ‘প্রীতিভাজনেশু’ ইত্যাদি। কনিষ্ঠ ও স্নেহ সম্পর্কের লোকদের সম্বোধন করা হয়- ‘কল্যাণবরেশু’, ‘স্নেহভাজনেশু’, ‘প্রীতিভাজনেশু’ ইত্যাদি।
৪. পত্রের বক্তব্য অংশের শুরুতে, বয়স ও সম্পর্ক অনুযায়ী বাক্য লেখা হয়। যেমন: গুরুজনকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়- তসলিমবাদ পাক জনাবে আরজ এই..., হাজার হাজার সালাম ও কদমবুসিবাদ পাক জনাব আরজ, শত শত প্রণামপূর্বক নিবেদন এই..., ইত্যাদি। সাধারণ ব্যক্তিদের কাছে বা সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে লিখতে গিয়ে লেখা হয়- দোয়া পর সমাচার এই..., বিনয় নিবেদন এই..., ইত্যাদি। সমপর্যায়ের লোকের কাছে লেখা হয়- আদর ও তসলিমবাদ এই..., উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখতে হয়- ‘যথাবিহীত সম্মানপূর্বক অধীনের বিনীত নিবেদন এই... ইত্যাদি।
৫. পত্রের শেষে ডানদিকে ‘ইতি’ লেখার রীতি রয়েছে। অতএব লেখক নিজের নাম স্বাক্ষর করে প্রাপক গুরুজন হলে ‘খাদেম’ ‘সেবক’ ‘প্রণত’ ‘স্নেহাকাজক্ষী’, ‘আপনার স্নেহের’ ইত্যাদি লেখা রীতি আছে। স্নেহভাজন হলে ‘আশীর্বাদক’, ‘শুভার্থী’ ইত্যাদি এবং সাধারণত ভদ্রলোক হলে ‘নিবেদক’ এবং সমপর্যায়ের হলে, ‘ভবদীয়’ ‘প্রীতিমুগ্ধ’, ‘গুণমুগ্ধ’ ‘আপনারই’ ‘বিনায়বনত’, ‘বিনীত’ ইত্যাদি লিখতে হয়।
৬. খামের ডানদিকে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা এবং বাঁ প্রেরকের ঠিকানা লিখে দিতে হয়। প্রাপকের নামের পূর্বে ‘পূজনীয়’, ‘শ্রদ্ধেয়’, ‘স্নেহভাজন’ জনাব ইত্যাদি লেখা হয়।
৭. প্রাপক যদি মহিলা হয় তবে বেগম, পূজনীয়া, প্রণতা, কল্যাণীয়া ইত্যাদি লেখার প্রচলন রয়েছে।
৮. অন্যান্য পত্র লেখার সময়ও কতকগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। পত্রের সূচনায় ‘জনাব’, ‘মহাশয়’, ‘মহাত্মন’ ইত্যাদি এবং পত্রের শেষে ‘বিনীত’, ‘আরজ গুজার’, ‘ভবদীয়’ ইত্যাদি লিখতে হয়।
৯. ব্যবসায়িক ও সরকারি পত্রে বিধিবদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। এই পত্র যথারীতি সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হয়। সরকারি পত্রে শুরুতে ‘মহামহিম’, ‘বরাবর’ ইত্যাদি, সূচনায় ‘মহাত্মন’ এবং সমাপ্তিতে ‘আপনার একান্ত অনুগত’, ‘ভবদীয়’, ‘আপনার বিশ্বস্ত’ ইত্যাদি লিখতে হয়। ব্যবসায়িক চিঠিতে ‘মহোদয়’, ‘বরাবর’, সমাপ্তিতে ‘বিশ্বস্ত’, ‘ভবদীয়’ ইত্যাদি লিখতে হয়।

পত্র লেখার কয়েকটি নমুনা

১. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পত্র

ক) পারিবারিক পত্র

১. স্কুলে অনুষ্ঠিত একটি উৎসবের বর্ণনা দিয়ে পিতার নিকট একটি পত্র লিখ।

ইয়ারব

রামবাবু রোড

ময়মনসিংহ

১৪ই জুলাই ২০০৮

পাক জনাবেষু

আব্বাজান

আমার সালাম জানবেন। বেশ কয়েক দিন হল আপনাদের কোনো সংবাদ দিতে না পেরে আমি বিশেষ দুঃখিত। তার প্রধান কারণ হল গতকাল আমাদের স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেজন্য আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। গতকালের উৎসবের বিবরণ এবং সেই উপলক্ষে আমার ব্যস্ত থাকার কারণ জানাচ্ছি।

গতকাল শুক্রবার সকল স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালতের ছুটির দিন ছিল। উপরন্তু সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য দোকানপাট, কলকারখানা বন্ধ ছিল। এই দিনটিকেই আমাদের স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী উৎসবের জন্য পূর্ব হতে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্কুলের নিজস্ব মিলনায়তনে। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পনের বিশজন ছাত্রকে সমগ্র স্কুলপ্রাঙ্গণ সাজাবার জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেদিন আমাদের প্রায় রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।

পরদিন অর্থাৎ শুক্রবারদিন সকালবেলাও আমরা কয়েকজন মিলে তিন-চার ঘণ্টা খেটে স্কুলের সদর দরজা থেকে মিলনায়তনের দরজা পর্যন্ত রঙিন কাগজ, পাতা ও ফুল দিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত করি।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকাল তিনটায়। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সভাপতি জেলা প্রশাসক মহোদয় নির্দিষ্ট সময়েই এসে উপস্থিত হন। কাঁটায় কাঁটায় তিনটার সময়ই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অবশ্য বেলা দুটা থেকেই বিভিন্ন কাজে স্কুলে আমাদের উপস্থিত থাকতে হয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আধুনিক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, কৌতুক, আবৃত্তি, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি কেবল বিতর্ক, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ। প্রায় দু ঘণ্টায় প্রতিযোগিতাগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর এই প্রতিযোগিতার এবং গত বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি হিসেবে আগত এই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুদ্দিন আহমেদ। গত বার্ষিক

রচনা সম্ভার

পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য এবং পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়ায় আমি মোট পাঁচটি পুরস্কার পেয়েছি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হয়েছি। একটি মেডেলসহ পনেরটি বই আমাকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

প্রধান অতিথি ও সভাপতির ভাষণ শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আমার পুরস্কার লাভের কথা বাড়ির সবাইকে জানাবেন। আমি এখানে ভালো আছি। সামনে পরীক্ষার জন্য আমাকে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। ছোট ভাই-বোন দুটি যেন ঠিক মতো পড়াশোনা করে, আপনি ও আম্মাজান সৈদিকে খেয়াল রাখবেন। বিধাতার কাছে আপনাদের সকলের জন্য মজ্জল কামনা করছি।

ইতি

আপনার স্নেহের

কবির

প্রেরক কবির হোসেন রামবাবু রোড ময়মনসিংহ সদর	প্রাপক শ্রদ্ধেশ্বর নবী হোসেন গ্রাম : পলাশপুর থানা ও ডাকঘর : ত্রিশাল জেলা : ময়মনসিংহ	ডাকটিকেট
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

২. নিরাপদে ছাত্রাবাসে পৌছানোর সংবাদ জানিয়ে পিতার কাছে পুত্রের চিঠি (মুসলিম রীতিতে)।

এলাহি ভরসা

স্কুল ছাত্রাবাস

ময়মনসিংহ জেলাস্কুল

ময়মনসিংহ

১৪ই জুলাই ২০০৮

পরম শ্রদ্ধেশ্বর আব্বাজান

আমার সালাম জানবেন। বাড়ির বড়দের সালাম ও ছোটদের দোয়া জানাবেন। আপনার আশীর্বাদ ও দোয়ার বরকতে আমি যথাসময়ে নিরাপদে ছাত্রাবাসে এসে পৌঁছেছি। আসার পথে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু ও সহপাঠী হাফিজও এসেছে। এখানে আসার পর থেকে পড়াশোনার বেশ চাপ পড়েছে। রীতিমতো ক্লাস হচ্ছে। নিয়মিত পাশ্চিক পরীক্ষা আমাদের স্কুলের ঐতিহ্য। আমাকে তাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। রমজানের ছুটিতে বাড়ি থাকাকালীন পড়ালেখার যা গাফিলতি হয়েছিল তা এখন পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি দোয়া করবেন। আম্মাজানকেও দোয়া করতে বলবেন। আমার সাধনায় যেন আমি সফল হতে পারি।

ফর্ম - ৮ ওষ্ঠ রচনা-স

৫৭

ছাত্রাবাসের নিয়ম-শৃঙ্খলা খুব ভালো। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ছোটদের জন্য রইল আমার অনেক দোয়া।

প্রেরক সুমন স্কুল ছাত্রাবাস ময়মনসিংহ	প্রাপক জনাব হাবিবুর রহমান গ্রাম : আছিম ডাকঘর : ফুলবাড়িয়া ময়মনসিংহ	ডাকটিকেট
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------

ইতি
আপনার দোয়া প্রার্থী
সুমন

৩. পিতার কাছে পুত্রের চিঠি (হিন্দু রীতিতে)।

ওঁ

জেলাস্কুল ছাত্রাবাস
খুলনা
১৪ই জুলাই ২০০৮

পরমপূজনীয় বাবা

আমার প্রণাম জানবেন। আপনার আশীর্বাদে যথাসময়ে নিরাপদে আমি আমার স্কুল ছাত্রাবাসে এসেছি। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু ও সহপাঠী সুমনও ছিল। আসার পথে কোনোরকম অসুবিধা হয়নি। এখানে আসার পর পড়াশোনার বেশ চাপ পড়েছে। আমাদের স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হয়। নিয়মিত পাঞ্চিক পরীক্ষা আমাদের স্কুলের ঐতিহ্য। নিয়ম-শৃঙ্খলার খুব কড়াকড়ি।

আমাকে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। গত পূজার ছুটিতে বাড়ি থাকাকালীন পড়াশোনার যে ক্ষতি হয়েছে তা এখানে এসে আমি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন আমার সাধনা সফল হয়।

মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। ছোট ভাই-বোনদের জন্য রইল সীমাহীন স্নেহশিস।

ইতি
আপনার স্নেহের
তমাল

প্রেরক তমাল ছাত্রাবাস জেলা স্কুল খুলনা	প্রাপক শ্রী অসীম কুমার চন্দ্র গ্রাম : রাঙামাটি ডাকঘর : ফুলবাড়িয়া জেলা : ময়মনসিংহ	ডাকটিকেট
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

রচনা সম্ভার

৪. মায়ের কাছে মেয়ের চিঠি (মুসলমান মতে)।

ইয়ারব

সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

শেরপুর

১লা জুন ২০০৮

শ্রদ্ধেয় আম্মাজান

আমার সালাম নেবেন। আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় আমি নিরাপদে বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে এসে পৌঁছেছি। পথে আমার কোনো রকমের কষ্ট হয়নি। এসেই দেখলাম সবাই লেখাপড়া নিয়ে মেতে উঠেছে। এমনিতেই আমাদের স্কুলে পড়ালেখার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি, তার ওপর সাময়িক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেছে। তাই আমি আর দেরি না করে অন্যান্যদের মতো পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। কারণ বাড়িতে ছুটি কাটাতে যাওয়ার ফলে আমার পড়াশোনার অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমাকে এখন অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আপনি পরম দয়াময় আল্লাহুতায়ালার কাছে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আপনাদের আশা পূরণ করতে পারি।

আমি ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন জানাবেন। আব্বাকে আমার সালাম জানাবেন। ছোট বোন রুমাকে আমার অনেক আদর।

ইতি

আপনার অতি আদরের

কাশফিয়া

প্রেরক কাশফিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয় শেরপুর	প্রাপক জনাব সাহানাজ পারভিন ৫৩ সার্কিট হাউজ রোড নেত্রকোনা (সদর) জেলা : নেত্রকোনা	ডাকটিকেট
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------

৫. মায়ের কাছে মেয়ের চিঠি (হিন্দু রীতিতে)।

শ্রী শ্রী দুর্গা

বিদ্যাময়ী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়
কুমিল্লা
১৪ই জুলাই ২০০৮

পরম পূজনীয় মা

আমার প্রণাম জানবেন। ঈশ্বরের করুণায় আর আপনাদের আশীর্বাদে নিরাপদে বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে এসে পৌঁছেছি। পথে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। এসেই দেখতে পেলাম পড়াশোনা নিয়ে সবাই মেতে আছে। কারণ ইতোমধ্যে সাময়িক পরীক্ষার বিভ্রাট প্রচারিত হয়েছে। আমি আর পড়াশোনার ব্যাপারে বিলম্ব করতে পারছি না। কারণ আমার অনেক পড়া বাকি। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে লেখাপড়ায় অবহেলা করেছিলাম। অনেক পিছিয়ে আছি বলে বিপদ মনে হচ্ছে। তাই আমাকে আরো বেশি পরিশ্রম করে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। আমার ক্লাসের বান্ধবীরা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করছে। আপনি পরম দয়াময় ভগবানের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন আপনাদের আশা পূরণ করতে পারি।

আমি আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আপনারা কে কেমন আছেন জানাবেন। বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন। ছোট ভাই রাতুলকে আমার স্নেহাশিস।

ইতি
আপনার স্নেহের
রমলা

প্রেরক রমলা ছাত্রীবাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কুমিল্লা	প্রাপক অমিতা চক্রবর্তী ৩৫ সদর রোড ফরিদপুর	ডাকটিকেট
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------

রচনা সম্ভার

৬. পড়াশোনা ও স্বাস্থ্য রক্ষার কিছু উপদেশ দিয়ে তোমার ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখ।

এলাহি ভরসা

জেলাস্কুল

নওগাঁ

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮

স্নেহের আরিফ

তুমি আমার দোয়া নিও। গতকালই তোমার পত্র পেয়েছি। বাড়ির সবাই ভালো আছে জেনে ভালো লাগছে। পরীক্ষায় তুমি দ্বিতীয় হয়েছ জেনে খুব খুশি হয়েছি। আমরা জানি পড়াশোনার প্রতি তোমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। মেধা ও স্মৃতিশক্তিও তোমার ভালো। তাই পরীক্ষার ফলাফলের কথা শুনে আশ্চর্য হইনি। আশা করি ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে।

তোমার চারপাশে যাই ঘটুক না কেন প্রতিদিনের পড়া অবশ্যই সেদিন শেষ করবে। নিয়মিত পড়ালেখা করার জন্য নিজেই একটা রুটিন তৈরি করে নেবে। রুটিনে বাইরের বইপত্র বা পত্রপত্রিকা পড়বার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রাখবে। কারণ নানা রকম জ্ঞানেরও দরকার আছে।

পড়াশোনা করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর রাখবে। কেননা স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে, শরীর সুস্থ না থাকলে পড়াশোনা করতে পারবে না। বাজারের আজো বাজে খাবার একেবারেই খাবে না। গোসল, আহার, ঘুম, বিশ্রাম বা খেলাধুলা এসব নিয়মিত করতে হয়। খেলাধুলার সুযোগ কম থাকলে প্রতিদিন ঘরের মধ্যেই সামান্য হালকা ব্যায়ামের অভ্যাস করবে। বেশি রাত জাগবে না। দশটা এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়বে। বেলা ওঠার আগেই উঠে হাতমুখ ধুয়ে নামাজ পড়ে নেবে। তারপর হালকা কিছু খেয়ে পড়তে বসবে। ক্লাস্তি বা অমনোযোগ নিয়ে কখনও পড়বে না।

আজ এই পর্যন্ত। আমি ভালো আছি। আমি সামনের কয়েকদিনের বন্ধে বাড়ি আসব। আমার পড়াশোনা ভালো চলছে। বাবা-মাকে আমার সালাম। ছোটদের জন্য রইল দোয়া।

ইতি
তোমার ভাই
রফিক

প্রেরক রফিক জেলা স্কুল নওগাঁ	প্রাপক আরিফ প্রযত্নে : কবির উদ্দিন আহমেদ গ্রাম : পশুপতি নওগাঁ	ডাকটিকেট
---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------

৭. শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করে তোমার ছোট বোনের কাছে একখানা চিঠি লিখ।

ইয়ারব

মীরপুর, ঢাকা

১লা জুলাই ২০০৮

স্নেহের বুবি,

তোমার জন্য রইল আমার অসংখ্য আশীর্বাণী। আমি তোমার হাতের সুন্দর চিঠিটা পেয়েছি। পেয়ে খুব খুশিও হয়েছি। তবে কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েছি তোমার অবস্থা অনুধাবন করে। আমি ছাত্রীবাসে চলে আসাতে তুমি একা হয়ে পড়েছ এটা সত্যি। কিন্তু মাকে সাহায্য করার কেউ নেই এমন কথা তোমার কাছে আমি আশা করিনি। তুমি মায়ের পাশে আছ সেটাই যথেষ্ট।

তবে সংসারের কাজের ব্যাপারে তোমার আলসেমির কথা আমার জানা আছে। সে অভ্যাস তোমাকে বদলাতে হবে। সংসারে যদি একটু শ্রম দাও তা হলে সংসার অনেক সুখের হবে। মনে রেখো কোনো কাজই খারাপ নয়। কোনোটাই ছোট কাজ নয়। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে খুব ভালো লাগে। কে করবে সে কাজ? কাজের মেয়ে? তারও তো হাজার কাজের ঝামেলা। কাজের মেয়ে থাকতে হবে এমনও তো নয়। তাই বলি যতটুকু পার সংসারের কাজ নিজেই করো। কাপড় কাচা, ঘর মোছা, বাগানের পরিচর্যা করা, বিছানাপত্র গোছানো, এমনকি মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করা, এসবই তো তুমি করতে পার। শুধু টেলিভিশন দেখবে আর ক্যাসেটে গান শুনবে এটা ঠিক নয়।

মনে রাখবে, পরিশ্রম করলে শরীর ভালো থাকে। তোমার শ্রমের ফলে সংসার সুন্দর হয়ে উঠবে। মনে রেখো, জীবনে একদিন অনেক বড় দায়িত্ব নিতে হবে। এখন কাজ না করলে পরে করতে গিয়ে কষ্ট হবে। কোনো কাজকেই তাই অবহেলা করা উচিত নয়। নিজের কাজে কোনো সংকোচবোধ থাকা উচিত নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে আনন্দও আছে। বুঝতে শেখ। জীবন সফল করার জন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার। তাই শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে।

আজকে এখানেই শেষ করছি। মা-বাবাকে আমার সালাম।

ইতি

তোমার বড় বোন

হাসনা

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকেট
.....	
.....	
.....	

রচনা সম্ভার

৮. ছাত্রাবাস জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

সিলেট সদর

১লা জুলাই ২০০৮

প্রিয় বিপুল

অনেক দিন হয় তোমার পত্র পাইনি। আশা করি তুমি ভালো আছ। আমি এখন কিশোরগঞ্জ জেলা স্কুলের ছাত্রাবাসে থেকে জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করছি। ছাত্রাবাসজীবন প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগত। বাড়ি থেকে এখানে থাকতে বেশ কষ্ট হত। সবাইকে ছেড়ে এসে কেমন যেন একা একা মনে হত। বুঝতাম ছাত্রাবাস আর বাড়ির মধ্যে অনেক তফাৎ। তবে ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। তবুও বাড়ির জন্য মন কেমন করে। মাঝে মাঝে তাই ছুটি পেলেই বাড়ি চলে যাই। বাবা-মা ও ভাই-বোনদের সঙ্গে কাটিয়ে আসি। বড় ভাই মাসে একবার বা দুইবার এসে খোঁজ নিয়ে যান। টাকা পয়সা দিয়ে যান। কিছু লাগলে তাও কিনে দিয়ে যান।

আমরা একটি কামরায় চারজন মিলে থাকি। চারপাশে চারটি চৌকি। চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি আছে। পড়াশোনা ও ফাঁকে ফাঁকে গল্পসল্প নিয়মিত হয়। তবে নিভৃত পাঠে ব্যাঘাত ঘটে। অনেক সময় গল্পগুজবে পড়াশোনারও কিছু ক্ষতি হয়। বাতি জ্বালিয়ে রাখলে অনেক সময় আপত্তি আসে। ছাত্রাবাসে না থাকলে বাড়ির খাওয়ার মাধুর্য কেউ বুঝতে পারবে না। ছাত্রাবাসের খাওয়া অতি সাধারণ ও একঘেয়ে। ক্ষুধার জ্বালায় তাই খেতে হয়।

আমাদের ছাত্রাবাসের সুপার সাহেব খুব ভালো। তিনি ধার্মিক ও বিনয়ী লোক। তিনি আমাদের দিকে সব সময় খেয়াল রাখেন। তিনি কোনোরকম হৈহুল্লোড় পছন্দ করেন না।

বিকালে আমরা কখনও বেড়াতে যাই, কখনও স্কুলের মাঠে খেলাধুলা করি। সন্ধ্যায় যথাসময়ে ছাত্রাবাসে ফিরে আসি। হাতমুখ ধুয়ে অঙ্গু করে নামাজ পড়ি। পরে পড়তে বসি। তবে মাঝে মাঝে গৎবাঁধা এই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা লাগে। বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করে।

আমি ভালো আছি। পড়াশোনা করছি মোটামুটি। মাঝে মাঝে তুমি চিঠি দিলে খুব খুশি হব।

ইতি

তোমার বন্ধু, আরিফ

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকেট
.....	
.....	
.....	

৯. বনভোজনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লিখ।

যশোর

২০শে আগস্ট ২০০৮

প্রিয় দীনেশ

প্রায় দিন পনের আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হওয়ায় দুঃখিত। তবে এর পেছনে কিছু কারণ আছে। আমাদের শ্রেণীর ছাত্ররা মিলে বনভোজন করার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। নানাজনের নানামতের জন্য শুধু দেরি হচ্ছিল। অবশেষে সকলে এক হয়েছি যে, আমরা সোনারগাঁ যাব। সোনারগাঁ এক সময় স্বাধীন সুলতানের রাজধানী ছিল। সোনারগাঁ লোকশিল্পের জাদুঘর আছে। আছে সুলতানদের অনেক স্মৃতিবিজড়িত স্থান। আমরা ২৫শে আগস্ট ভোর বেলা বাসে করে যাত্রা শুরু করব।

তুমি অবশ্য ২৪শে আগস্ট সন্ধ্যার মধ্যে চলে আসবে। সঙ্গে তোমার ছোট ভাই টুটুলকেও নিয়ে আসবে। খুব মজা হবে। আসবার সময় সঙ্গে করে তোমার ক্যামেরার ব্যাগটি নিয়ে আসবে। এদিকে অন্যান্য ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি।

ইতি

তোমার বন্ধু

রমেশ

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকেট
.....	
.....	
.....	

১০. একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বান্ধবীর কাছে একটি চিঠি লিখ।

টাজাইল

২৫শে জুলাই ২০০৮

প্রিয় সুমী,

তুমি আমার শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করো। তোমার সংবাদ অনেক দিন ধরে পাইনি। আশা করি ভালোই আছ। পড়াশোনা নিয়ে বোধহয় খুব ব্যস্ত আছ।

তোমাকে আমি আমার একটি খুশির খবর জানাচ্ছি। আমরা আমাদের ক্লাসের মেয়েরা মিলে মহাস্থানগড় দেখতে গিয়েছিলাম। রফিক স্যার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদের ভূগোল শিক্ক, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। আমরা একটা বাস রিজার্ভ করে গিয়েছিলাম।

রচনা সম্ভার

আমরা সবাই মিলে নাস্তা করলাম বগুড়া শহরে। তারপর প্রায় দশটার দিকে মহাস্থানগড়ে পৌঁছলাম। পুরানো দিনের স্মৃতি আমাদের খুব ভালো লাগল। স্যার বললেন, মহাস্থানগড় নাকি খুবই প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র। আর্যদের আগমনের পূর্বে সমতল থেকে একটু উঁচু এই ভূমিতে জনবসতি ছিল। তারা সভ্যতার দিক থেকে ছিল অনেক উন্নত এবং সমৃদ্ধ। তখন এই অঞ্চলের করতোয়া নদী অনেক বড় আকারের ছিল। তারপর বৌদ্ধ সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা এবং মুসলিম সভ্যতার জন্য এই স্থান বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। নানা প্রাচীন ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখে মুগ্ধ হলাম। স্যার আমাদের সেগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে শোনালেন। আমরা মহাস্থানগড়ের জাদুঘর দেখলাম। সাধক শাহ সুলতানের কাহিনী শুনলাম। এক স্থানে জীয়ৎকুণ্ড বলে এক বিখ্যাত কূপের নিদর্শন দেখলাম। তারপর দেখলাম ছোট ছোট কুঠিরওয়ালা ঘর। সেগুলো ছিলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাধনার স্থান। এককালে এই স্থান নাকি রাজধানী ছিল। হাজার হাজার লোকের কর্মব্যস্ততার স্থান আজ বলতে গেলে নিস্তম্ভ ধ্বংসপুরী। সন্ধ্যার আগে আগে আমরা ফিরতি পথে রওয়ানা হলাম।

আমি ভালো আছি। আগামীতে তোমার কুশল সংবাদ চাই।

ইতি

তোমার প্রিয় বান্ধবী

রানু

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকেট
.....	
.....	
.....	

১১. তোমার দেখা একটি বিজ্ঞান-মেলায় বর্ণনা দিয়ে বান্ধবীর কাছে একটি পত্র লিখ।

ঢাকা

৪ঠা জুলাই ২০০৮

প্রিয় মিতালী

তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে ভালো আছ জেনে খুশি হলাম। কথা ছিল পরীক্ষার পরে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হল না। ত্রৈমাসিক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিয়েছে। আজ তোমাকে আমার দেখা একটা বিজ্ঞান-মেলায় বর্ণনা দিচ্ছি। কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে সম্প্রতি এই মেলা হয়ে গেল। আমাদের শ্রেণীর প্রায় সবাই আমাদের বিজ্ঞান আপার নেতৃত্বে বাসে করে এই মেলা দেখতে গিয়েছিলাম।

৬৫

ফর্ম - ৯ ৬ষ্ঠ রচনা-স

দেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত খুদে বিজ্ঞানীরা এ মেলায় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে গেল। এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। কুমিল্লার খুদে বিজ্ঞানীরা এ মেলার আয়োজন করেছিল। সপ্তাহব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

তুমি হয়তো বিশ্বাস করবেনা যে, খুদে বিজ্ঞানীরা কী নিপুণভাবে তাদের উদ্ভাবিত প্রকল্পগুলো প্রদর্শন করেছে। তাদের প্রকল্পে ছিল ইলেকট্রিক টেকি, ইলেকট্রিক বেল, টেলিস্কোপ, সৌরচুল্লি ইত্যাদি। মাটি দিয়ে নিপুণ হাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন মডেল তৈরি করেছিল। মডেলের মধ্যে প্রাণীর চোখ, প্রাণিকোষ, উদ্ভিদকোষ ও প্রাণীর অস্থি। রসায়ন বিজ্ঞানেরও চমৎকার প্রদর্শন করা হয়েছিল। যেমন পানি বিশ্লেষণ, বিদ্যুৎপ্রবাহ।

আমার মনে হয় এই ধরনের বিজ্ঞান-মেলার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রত্যেক স্কুলেই এধরনের মেলার আয়োজন করা উচিত। এ ধরনের মেলার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শিশু-কিশোরদের প্রতিভার বিকাশই শুধু নয় প্রতিভার আবিষ্কারও সম্ভব। পরিশেষে তোমার মজ্জাল কামনা করে শেষ করছি।

ইতি
তোমার বান্ধবী
রানু

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকেট
.....	
.....	
.....	

১২. তোমার দেশের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে তোমার কোনো বিদেশি বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখ।

চট্টগ্রাম
১৫ই জুলাই ২০০৮

প্রিয়

সুজুকি

তোমার ১.৭.০৮ তারিখে লেখা চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। সেই সঙ্গে তোমার পাঠানো ছবির কার্ডগুলোও আমার হাতে পৌছেছে। অপূর্ব সুন্দর প্রতিটি কার্ডের ছবি। তোমার দেশ জাপানের নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে তোমার চিঠিতে। একবার তোমাদের দেশে যেতে খুব ইচ্ছে করছে। তুমি সুন্দর বাংলা শিখেছ। তোমার বাংলা হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার ফুজিয়ামার ছবিটি সত্যিই বিস্ময়কর। ছবি দেখে মনেই হয়না তার পেটের ভিতর থেকে উত্তপ্ত লাভা বের হচ্ছে। হিরোশিমার স্মৃতিসৌধের ছবিটি দেখে আমার চোখে পানি এসেছে। মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে।

রচনা সম্ভার

একটা বোমার আঘাতে সমস্ত শহরটা ছাই হয়ে গেল। সেদিন আমাদের মতো কত হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু প্রাণ হারিয়েছিল।

তুমি আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। তুমি তো জানই আমার দেশের নাম বাংলাদেশ। অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই দেশ পেয়েছি। একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমরাও অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি।

আমাদের এই দেশে এখন প্রায় চৌদ্দ কোটি লোকের বাস। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। আমাদের দেশের মাটি খুবই উর্বর। বীজ বপন করলে সেখানে সোনার ফসল ফলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। কৃষিই তাদের প্রধান জীবিকা। বহু নদনদী এদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। ভারি সুন্দর আমাদের এই দেশ। এদেশের সবুজ মাঠের শোভা বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের এদেশের কয়েকটি ছবি তোমাকে পাঠালাম। দেখবে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব মনোরম। আমাদের দেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। তোমাদের দেশের তুলনায় আমরা শিল্পে খুবই অনগ্রসর। তবে আমাদের দেশ থেকে চা, পাট ও প্রস্তুতকৃত পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

তোমার দেশে শিশুদের মর্যাদা ও যত্ন খুব বেশি। আমাদের সমস্যা অনেক। বর্তমানে আমাদের শিশুদের আহাৰ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার থেকে শিশুদের পোলিও, কৃমি প্রভৃতির টিকা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন খাওয়ানো হচ্ছে। আমি আশা করছি একদিন আমাদের শিশুরাও ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে বড় হওয়ার সুযোগ পাবে।

আমাদের দেশে আসার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তুমি আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নিও।

ইতি
তোমার অনীতা

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকেট
.....	
.....	
.....	

খ) নিমন্ত্রণ পত্র

১. স্কুলে অনুষ্ঠিতব্য মিলাদ মহফিলে যোগদানের জন্য রচিত একটি নিমন্ত্রণ পত্র।

এলাহি ভরসা

জনাব

আসসালামু আলাইকুম। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রোজ শূক্রবার বিকাল ৩টার সময় আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ মাওলানা মুহাম্মদ জমির উদ্দিন সাহেব উক্ত মহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ও মহানবীর (স) জীবনী আলোচনা করবেন।

আপনি সবাস্থ্যব যোগদান করে উক্ত মহফিলকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করবেন।

মাদারীপুর

১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮

আরজ গুজার

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

সম্পাদক

মাদারীপুর সরকারি জেলা স্কুল

২. জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত চা চক্রে যোগদানের জন্য রচিত একখানি নিমন্ত্রণ পত্র।

বন্ধু/বান্ধবী

আগামী ২৩শে আগস্ট রোজ বুধবার বিকাল সাড়ে চারটায় আমার ছোট ভাই টুটুলের দশম জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে একটি ঘরোয়া চা-চক্রে আয়োজন করা হয়েছে।

তুমি/ আপনি অনুগ্রহপূর্বক উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে বাধিত হব।

স্থান : (গ্রাম : জাহিরাবাদ (মুন্সিবাড়ি)

পো : এখলাসপুর

থানা : মতলব

জেলা : চাঁদপুর

বিনীত

শরিফ আহমেদ

৩. বড় বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুর নিকট একটি পত্র।

প্রিয় রতন

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছ। তুমি শুনে খুশি হবে যে আমার একমাত্র বড় বোন আশিয়া খাতুনের বিয়ে আগামী ১২ই মার্চ বুধবার ঠিক করা হয়েছে। ঐদিন বর অধ্যাপক রেজাউল করিমসহ বরযাত্রী আনুমানিক বেলা বারোটায় আমাদের গৃহে বিবাহ মজলিসে উপস্থিত হবেন। বিবাহ উপলক্ষে আমরা আমাদের সাধ্যমতো আয়োজন করেছি। পত্র দিয়ে নিমন্ত্রণ করাতে আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না। তুমি অবশ্যই আগের দিন ১১ই মার্চ আমাদের

রচনা সম্ভার

বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিবাহ উৎসবে যোগদান করবে। তোমার উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ও আনন্দ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

জেলা স্কুল রোড
ফরিদপুর (সদর)
ফরিদপুর।
৭ই মার্চ ২০০৮

ইতি
প্রীতিমুগ্ধ
সদরুল

৪. স্কুলে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে যোগদানের জন্য রচিত একটি নিমন্ত্রণ পত্র।

জনাব/মহাশয়

আগামী ৩রা এপ্রিল রোজ সোমবার অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় অত্র নোয়াখালী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নোয়াখালী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব নবী হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আমিনুল ইসলাম। এ অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

বিনীত নুরুল্লাহ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
নোয়াখালী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

গ) অভিনন্দন পত্র

১. কোনো খ্যাতনামা কবির আগমন উপলক্ষে রচিত একখানি মানপত্র।

বাংলাদেশের জনগণের কবি ও মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব সাদিক -এর বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন উপলক্ষে মানপত্র

হে কবি

আমাদের ত্রিশাল আধা শহর আধা গ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সভায় পদার্পণ করে, আপনাকে বরণ করার যে সুযোগ আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন সেজন্য প্রথমেই জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

হে দেশপ্রেমিক কবি

কবিগণ তাদের কাব্যপ্রেরণার মাধ্যমে সমাজের জীর্ণতার খোলস ছিন্ন করে নতুন যুগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তাই হয়তো কবিদের মনে ফাল্গুনের বসন্ত চিরদিন বিরাজ করে। আপনার হৃদয়বসন্তের বায়ুস্পর্শে আজ আমাদের মনেও নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে। আপনার কাব্যের মাধ্যমেই এতদিন আপনার সজ্ঞা আমরা পরোক্ষ

যোগাযোগে আবদ্ধ ছিলাম। এখন প্রত্যক্ষ সাহচর্যে সে পরিচয় আরো মধুরতর ও নিবিড়তর হল। অনাগত দিনে আপনার নতুন নতুন কাব্য, আপনার আত্মার সৌরভ, আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে আমাদের জীবন আরো মাধুর্যমণ্ডিত করবেন। আপনার দেশপ্রেম মাতৃভূমিকে আরো সুখমামণ্ডিত করুক এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

হে মহানুভব কবি

আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা এমনভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছি যে আপনার সংবর্ধনার ন্যূনতম আয়োজনও আমরা করে উঠতে পারিনি। যা কিছু করা হয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। আপনি কবি, বাহ্যিক দৃষ্টি স্থূল কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি আপনার সূক্ষ্ম। বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে অন্তরের আবেগকেই কবি হিসেবে আপনি গুরুত্ব দিয়ে আমাদের লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবেন।

হে দরদি কবি,

যান্ত্রিক সভ্যতার এই যুগে আপনার মতো হৃদয়বান কবি ও মহান মুক্তিযোদ্ধার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য আর হবে কিনা সন্দেহ আছে। আপনার ভবিষ্যৎ আলোর আশা ও আশ্বাসের বাণী আমাদের হৃদয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকারে বিদ্যুৎস্ফটকের মতো চমকিত হোক। এই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার দীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা করি। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি যেন শতায়ু হয়ে দেশ ও জাতিকে নব নব পথের নির্দেশ দিতে সক্ষম হন।

ত্রিশাল

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

ইতি

আপনার আশীর্বাদ প্রার্থী

গুণমুগ্ধ ত্রিশাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ

২. জনৈক শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একখানি অভিনন্দন পত্র রচনা কর।

হোসেনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষক জনাব ইসমাইল হোসেন সাহেবের বিদায় উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে বিদায়ী

আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। আজ হৃদয় আমাদের ব্যথিত। আমরা আমাদের বৃকের বেদনা প্রকাশের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ছেড়ে তুমি যে হঠাৎ এমনি করে চলে যাবে আমরা তা ভাবতেই পারিনি। তোমাকে হারানোর বেদনায় আজ আমরা মুহূর্তমান। আমাদের মন শুধু বলছে ‘যেতে নাহি দিব’।

হে শিক্ষাগুরু

তোমার শিক্ষার আলোকশিখা তুমি আমাদের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছিলে। তোমার জ্ঞানের প্রদীপের উজ্জ্বল আলোতে আমরা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। অথচ আজ তোমাকে হারিয়ে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তোমার কাছ থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি, তা আমাদের জীবনপথের পাথর হয়ে থাকবে। তুমি তো চলে যাচ্ছে কর্তব্যের মহান ডাকে। তাই চোখের পানিতে আর ডেকে আনব না তোমার অকল্যাণ। তোমার চলার পথ মসৃণ ও সুন্দর হোক।

রচনা সম্ভার

হে মহান

তোমার প্রেরণা আর কর্মচাঞ্চল্য আমাদের দিয়েছে নতুন উৎসাহ। হোসেনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যে তোমার অমূল্য অবদান অনস্বীকার্য। তোমার উৎসাহেই পাই আমরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলার প্রেরণা। তোমার প্রচেষ্টাতেই আমাদের বিজ্ঞানাগার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তুমি আমাদের অন্তরে থাকবে চির অম্লান, অক্ষয়। তোমার আদর্শে আমাদের চলার পথ হোক ছায়াস্নিগ্ধ। আজ এই বিদায়বেলায় তোমার কাছে চাইছি আশীর্বাদ ও হৃদয়ের সুন্দর স্মৃতি। আমরা তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

হোসেনপুর
কিশোরগঞ্জ
১লা জানুয়ারি ২০০৮

তোমার স্নেহধন্য
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

ঘ) আবেদন পত্র

১. বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট ছুটির আবেদনপত্র লিখ।

তারিখ : ১১ই জুলাই ২০০৮

চাঁদপুর

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

এখলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়

চাঁদপুর।

বিষয়: বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির জন্য ছুটির আবেদন।

জনাব

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নিবেদন, আমি গত ৫-৭-২০০৮ থেকে ১০-৭-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত জ্বরে আক্রান্ত থাকায় ছয় দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে ও ক্লাস করতে পারিনি।

অতএব, জনাবের নিকট আকুল আবেদন, আমাকে উক্ত ছয় দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র

রুহুল আমিন

ষষ্ঠ শ্রেণী, ক শাখা

ক্রমিক নং- ৩

২. বদলিজনিত সনদপত্রের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদনপত্র।

তারিখ : ১১ই জুলাই ২০০৮

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

ব্লু বার্ড হাই স্কুল

সিলেট।

বিষয় : বদলি সনদপত্র প্রদানের জন্য আবেদন।

জনাব

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার পিতা সরকারি চাকরি করার কারণে হঠাৎ সিলেট থেকে ঢাকা বদলি হয়ে গেছেন। ফলে আমি আর এই স্কুলে থেকে পড়াশোনা করতে পারছি না। আমি পঞ্চম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছি। বর্তমানে এই মর্মে আমার একটি বদলিজনিত সনদপত্রের প্রয়োজন।

অতএব, আপনার সমীপে, বিনীত প্রার্থনা এই যে, যথাশীঘ্র সম্ভব আমাকে বদলিজনিত সনদপত্র প্রদান করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত নিবেদক

আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্র

আলমগীর কবির

ষষ্ঠ শ্রেণী ক শাখা, ক্রমিক নং- ২

ব্লু বার্ড হাই স্কুল, সিলেট

৩. তোমার বিদ্যালয়ের কল্যাণ-তহবিল থেকে এককালীন সাহায্যের জন্য আবেদন পত্র লিখ।

তারিখ : ৭ই মে ২০০৮

বরাবর

প্রধান শিক্ষক

ধানমন্ডি বালিকা বিদ্যালয়

ঢাকা।

বিষয় : কল্যাণ-তহবিল থেকে সাহায্যের আবেদন।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ে গত এক বৎসর যাবত নির্ধারিত বেতন পরিশোধ করে অধ্যয়ন করে আসছি। হঠাৎ আমার আবার চাকরি চলে যাওয়ায় আমরা খুব আর্থিক অসচ্ছলতায় পড়েছি। এই মুহূর্তে

রচনা সম্ভার

আব্বার পক্ষে আমার লেখাপড়ার খরচ যোগানো অসম্ভব। তাই আমি বিদ্যালয়ের কল্যাণ-তহবিল থেকে এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য বিনীত প্রার্থনা করছি।

অতএব, জনাবের সমীপে আকুল আবেদন, আমি যাতে কল্যাণ-তহবিল থেকে এককালীন কিছু সাহায্য পেতে পারি তার সুব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক

আপনার একান্ত বাধ্যগত ছাত্রী

চম্পা আকতার

ষষ্ঠ শ্রেণী শাখা খ

ক্রমিক নং- ৭

৪. তোমার নিজ এলাকার বন্যাকবলিত জনসাধারণের সাহায্যার্থে জেলাপ্রশাসকের নিকট আবেদনপত্র লিখ।

তারিখ : ৭ই মে, ২০০৮, ধানমন্ডি, ঢাকা

বরাবর

জেলা প্রশাসক

টাঙ্গাইল

বিষয় : বন্যাকবলিত জনসাধারণের জন্য সাহায্যের আবেদন।

মহাত্মন

সবিনয় নিবেদন, দেলদুয়ার থানার পলাশ ও তার আশেপাশের বেশির ভাগ গ্রামই আকস্মিক বন্যায় অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র জনসাধারণের ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। মাঠের খাদ্যশস্য সব ভেসে গেছে। অধিকাংশ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। অবস্থা এমন চরম আকার ধারণ করেছে যে, বেশির ভাগ গ্রামবাসী এখন আশ্রয়হীন অবস্থায় অর্ধাহারে ও অনাহারে কাল যাপন করছে। কোথাও কোথাও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটেছে।

অতএব সবিনয় নিবেদন, দুস্থ মানবতার মজ্জালের জন্য অবিলম্বে পর্যাপ্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করতে আপনার মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদন

দেলদুয়ার থানার পলাশ গ্রামের

অধিবাসীর পক্ষে

মোহাম্মদ সমশের আলী

৫. তোমার এলাকার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য আশু প্রতিকার চেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি আবেদনপত্র লিখ।

তারিখ : ১৮ই মে, পলাশ

মাননীয় আবাসিক প্রকৌশলী

বিদ্যুৎ উন্নয়ন অধিদপ্তর

নেত্রকোনা।

বিষয় : নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য আবেদন।

মহোদয়

বিনীত নিবেদন, আমরা নেত্রকোনা পৌরসভার অধিবাসীবৃন্দ গত কয়েক সপ্তাহ যাবত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন। এমনকি এই এলাকার বিভিন্ন কলকারখানার উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও বিদ্যার্থীর পড়াশুনায় বিশেষভাবে অসুবিধা হচ্ছে। ধর্মীয় সামাজিক ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান- কোনো কিছুই আমরা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারছি না। মানুষের রোগ-ব্যাদি ও দেহে অস্ত্রোপচারকালে বিদ্যুতের বিভ্রাট মানুষের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

অতএব, মহোদয়, আমাদের অসুবিধাগুলো সবিস্তারে অনুধাবন করে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে বাধিত করবেন।

নিবেদক

এলাকাবাসীর পক্ষে

আবদুল জব্বার

নেত্রকোনা

রচনা সম্ভার

৬) পত্রিকায় প্রকাশিতব্য পত্র

১. তোমার গ্রামে ডাকঘর স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে চিঠি-পত্র বিভাগে একটি পত্র লিখ।

তারিখ : ৬ই জুন, নেত্রকোনা

মাননীয় সম্পাদক

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের তরফ থেকে লেখা নিম্নে উল্লিখিত চিঠিটি আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ- পত্রের চিঠিপত্র কলামে ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত

অবিনাশ কুমার সরকার

ডাকঘর চাই

জনাব

আমরা মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার কুসুমপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে একটি স্থানীয় ডাকঘরের অভাব অনুভব করছি। এই গ্রামের ডাকঘরটি নদীভাঙনের শিকার হয়েছে। এই গ্রামটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। এখানে অর্ধেকেরও বেশি লোক কৃষিজীবী। বাকি অর্ধেক লোক গোয়ালা, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক দেশ-বিদেশে চাকুরি-বাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে।

ডাকঘরের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দৈনিক এই গ্রাম থেকে গড়ে পঁচিশ-ত্রিশটি চিঠি, পাঁচ-ছয়টি মানি অর্ডার ও কিছু সংখ্যক পার্সেল বাইরে প্রেরিত হয়। এসব কাজের জন্য পাঁচ মাইল দূরে ঝিটকার ডাকঘরে দৌড়াতে হয়। উপরন্তু ঝিটকার ডাকঘরের পিয়ন নিয়মিত আমাদের গ্রামে আসে না। কোনো কোনো সময় চার-পাঁচ দিনের শতাধিক চিঠি-পত্র, মানি অর্ডার ইত্যাদি নিয়ে একবার মাত্র হাজির হয়। ফলে এই অঞ্চলের জনগণকে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

অতএব, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন, এই গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপন করে স্থানীয় অধিবাসীদের অসুবিধা দূর করে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করবেন।

বিনীত নিবেদক

অবিনাশ কুমার সরকার

কুসুমপুর গ্রামবাসীর পক্ষে।

২. ভোমার গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করে সম্পাদকের নিকট পত্র লিখ।

তারিখ : ১৭ই জুন, ২০০৮

সম্পাদক

দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা

জনাব

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে আমাদের প্রেরিত পত্রটি প্রকাশ করলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হব।

বিনীত

মোহাম্মদ আজিজুল হক

আটপাড়া, নেত্রকোনা।

পীড়িত মানবতাকে সাহায্য করুন

চাঁদপুর জেলার মতলব থানার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামের দশ মাইল এলাকার মধ্যে কোথাও দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতি বছর কলেরা, টাইফয়েড ও অন্যান্য ব্যাধিতে বহু মানুষ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে।

এ এলাকায় ধনী লোকের সংখ্যা খুব কম। তাই এলাকাবাসীর নিজস্ব দানে আমরা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। দরিদ্র জনসাধারণের দানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঘর নির্মাণ কোনো রকমে শেষ হয়েছে। কিন্তু আসবাবপত্র ও ঔষধ ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহ হয়নি। তাই আমরা নিঃসংকোচে বিত্তবান হৃদয়বান ব্যক্তিদের কাছে দুঃস্থ মানবতাকে সাহায্য করার আবেদন জানাচ্ছি।

নগদ টাকা, চেক ও অন্যবিধ সামগ্রী সম্পাদক মোহনপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঠিকানাতে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য আর্থিক ও দ্রব্যসামগ্রী সাহায্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের দুরবস্থা অনুভব করে যথাযথ সাহায্যের জন্য তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন সে জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক

মোহাম্মদ আজিজুল হক

গ্রামবাসীর পক্ষে

রচনা সম্ভার

চ) বাণিজ্যিক পত্র

১. ডাক যোগে বই পাঠানোর আবেদন জানিয়ে প্রকাশকের কাছে একটি চিঠি লিখ।

মাননীয় ব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ পুঁথিঘর

৬৫ নং, প্যারিদাস রোড, ঢাকা ১১০০।

বিষয় : ডাকযোগে বই পাঠানোর আবেদন।

জনাব

আমার সালাম নেবেন। মেহেরবানি করে আপনাদের প্রকাশিত নিম্নলিখিত বইগুলো খুব তাড়াতাড়ি ডাকযোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। অগ্রিম মূল্য বাবদ এক হাজার চারশত টাকার একটি ব্যাংক ড্রাফট পাঠালাম।

সংখ্যা ও বইয়ের নাম	লেখক	প্রকাশক	মূল্য (প্রতিটির)
১. আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা (১০ কপি)	শরফউদ্দিন	বাংলাদেশ পুঁথিঘর	৫০.০০
২. গুলিস্তার গল্প (১০ কপি)	জেবুন্নেসা খাতুন	"	৭০.০০
৩. মনীষীদের জীবনী (৭ কপি)	আবদুল জলিল	"	৫০.০০

গুভেচ্ছাসহ
মোঃ জসিম উদ্দিন
বইঘর
কুমিল্লা

অনুশীলনী

১. বই কেনার জন্য টাকা চেয়ে পিতার নিকট একটি পত্র লিখ।
২. জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখ।
৩. নিরক্ষরতা দূরীকরণে মতামত জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখ।
৪. স্কুলের নতুন ছাত্রীদের আচরণ কেমন তা জানিয়ে তোমার মাকে একখানি পত্র লিখ।
৫. কী ধরনের বই পড়া উচিত তা জানিয়ে ছোট বোনকে একটি চিঠি লিখ।
৬. তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে কী অভিলাষ তা জানিয়ে পিতাকে একটি চিঠি লিখ।
৭. তুমি সম্প্রতি পড়েছ এমন একটি বই সম্পর্কে তোমার মতামত জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখ।
৮. তোমার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সুধীবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখ।
৯. তোমাদের স্কুল-দিবস পালন উপলক্ষে অভিভাবকবৃন্দের জন্যে একটি নিমন্ত্রণপত্র রচনা কর।
১০. জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন প্রাক্তন ছাত্রের বিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা কর।
১১. তোমার বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে সাতদিনের ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একখানা দরখাস্ত লিখ।
১২. বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য তোমার প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট একখানা আবেদনপত্র লিখ।
১৩. বিকল হওয়া নলকূপ মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট একটি দরখাস্ত লিখ।
১৪. তোমার অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের গুরুত্ব আরোপ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি পত্র রচনা কর।
১৫. বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তোমার এলাকার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সংবাদপত্রে একখানি পত্র লিখ।
১৬. স্কুলের জন্য কিছু খেলার সামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কোনো কোম্পানিকে একটি পত্র লিখ।

ভাবসম্প্রসারণ

ইজিতময় অর্থপূর্ণ ভাবঘন বাক্য বা পঙক্তিকে সম্প্রসারিত করার নামই ভাবসম্প্রসারণ। অর্থাৎ ভাবের সজ্জাত ও সার্থক প্রসারণই ভাবসম্প্রসারণ। আরো একটু সহজ করে বলা যায়, গুঢ় ইজিতবহু কবিতার চরণ, গদ্যের বাক্য বা বাক্যাংশ এবং প্রচলিত প্রবাদবাক্য প্রভৃতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করার নামই ভাবসম্প্রসারণ। মূলত কোনো মূল বক্তব্য বা মর্মকথাকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ বা আলোচনাকেই ভাবসম্প্রসারণ বোঝায়।

সাধারণত বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টির মধ্যে এমন সব পঙক্তি, বাক্য বা বাক্যবন্ধ থাকে যার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিগূঢ় ভাব ও অর্থব্যঞ্জনা থাকে। ভাবসম্প্রসারণে সেই ভাবসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়।

ভাবসম্প্রসারণের কাজটি সার্থক ও সুন্দরভাবে করতে হলে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

যেমন :

১. পরিবেশিত পঙক্তি বা বাক্যটি বারবার পড়ে তার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ ও ভাবকে ঠিকমতো বুঝতে হবে।
২. পরিবেশিত পঙক্তি বা বাক্যে একটি মাত্র মূলভাব থাকবে। সেই মূল ভাবকে বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে।
৩. মূল ভাবটির সঙ্গে সজ্জাতি বা সামঞ্জস্য রেখে ভাবের সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় উপমা বা দৃষ্টান্ত এনে বক্তব্য বিষয়কে সহজ ও সরলভাবে প্রসারিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় যুক্তি দিতে পারলে আলোচনার বিষয় পাঠকের কাছে সহজ ও সুন্দরভাবে ধরা পড়ে। তবে অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব কথা সংযোজন করার দরকার নেই।
৪. ভাবসম্প্রসারণ করতে গেলে লক্ষ রাখতে হবে, বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গি যেন সহজ, সরল, পূর্ণাঙ্গ ও আকর্ষণীয় হয়।
৫. ভাবের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কবি বা লেখকের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।
৬. সম্প্রসারিত লেখার আয়তন হবে নির্ধারিত নম্বর অনুযায়ী।
৭. মনে রাখতে হবে ভাব সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য বক্তব্য বিষয়কে বুঝিয়ে বলা এবং বিশ্লেষণ করা। অন্তর্নিহিত ভাবের জটিলতা দূর করে সহজভাবে তা বুঝিয়ে বলা।

নিম্নে ভাবসম্প্রসারণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

১. মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।

মানুষ মাত্রই মরণশীল। জন্মগ্রহণ করলে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তবু এই রূপ-রস-গন্ধময় সুন্দর পৃথিবীকে ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম। উজ্জ্বল সূর্যালোক, পূর্ণিমা রাতে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, পুষ্পিত রঙের কানন, শ্যামল-সবুজ মাটি এবং চারপাশের বিচিত্র মানবজীবন ইত্যাদি ছেড়ে মানুষ

মৃত্যুবরণ করতে কেউই চায় না। চিরদিন এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে, মানুষের বিচিত্র জীবনের মধ্যে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে চায়।

মানুষের জীবনে মৃত্যু অনিবার্য। জীবনের এই পরিবর্তন অগ্রাহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এই পরিণাম সম্পর্কে সচেতন থেকেও মানুষ এই পৃথিবীকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসে। ভালোবাসে এই পৃথিবীর মনোরম সৌন্দর্য। মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর তার চারদিকে জীবনের যে আনন্দময় বিকাশ দেখে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য উপভোগ করে তা মানুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এই মায়াময় সুন্দর মনোরম পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে হবে বলেই হয়তো সে এই পৃথিবীকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসে। সৃষ্টিকর্তার আনন্দের ফল এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর প্রকৃতি ও মানবজীবন মানুষকে চিরকাল অভিভূত করে। আর সে কারণেই মানুষ এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় এই পৃথিবীর প্রতি মমত্ববোধের অকৃত্রিম উচ্চারণ।

২. কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন শিখা বলে- এসো মোর দাদা।

মানুষের সহজাত ধর্ম হল দরিদ্র ও অপেক্ষাকৃত গরীব আত্মীয়ের সঙ্গে সে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। এসব ব্যক্তিদের ধারণা, গরীব আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই তারা সব সময় তাদের এড়িয়ে চলতে চায়। অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে তাদের ভীতি প্রদর্শনও করা হয়।

অথচ এই শ্রেণীর লোক তাদের থেকে অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে নিজেরাই অত্যন্ত তৎপর ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের চরিত্রের এটা একটা বিশেষ দিক। মানুষ সব সময় মোহের পেছনে, বড় কিছু পেছনে ছুটে বেড়ায়।

কেরোসিন শিখা ও মাটির প্রদীপ দুয়েরই কাজ আলো দান করা। তবে মাটির প্রদীপের আলো কেরোসিন শিখার থেকে ম্লান। তাই কেরোসিন শিখার অহঙ্কার অনেক বেশি। সে নিজেকে উচ্চ শ্রেণীর বলে মনে করে। সে মাটির প্রদীপের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করে না। অধিকন্তু মাটির প্রদীপ পরিচয় দিতে চাইলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করে। অথচ এই কেরোসিন শিখা যখন তার চেয়ে আরো উচ্চ শ্রেণীর চাঁদের সঙ্গে সেধে আত্মীয়তা করতে চায়, তখন সে নিজের অবস্থানের কথা ভুলে যায়।

কবিতাংশটিতে এভাবে পৃথিবীর কিছু সংখ্যক মানুষের চরিত্রের সঙ্গে কেরোসিন শিখা, মাটির প্রদীপ ও আকাশের চাঁদের তুলনা করে মানুষের চরিত্রের একটি দুর্বল দিকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

**৩. নদীর ওপার বলে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।**

কোনো মানুষই তার নিজের সুখ-সম্পদে পরিতৃপ্ত নয়। অন্যের সম্পদ, অর্থ এবং সুখের প্রতি তার আকর্ষণ দুর্নিবার। নিজের চেয়ে অন্যের ঐশ্বর্য ও সুখকে বড় করে দেখা তার স্বভাব। সে কখনও নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

সুখ ও সম্পদ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে এবং মানুষ অশ্বভাবে তার পেছনে ছোটে। মানুষ নিজে যত সুখেই থাকুক না কেন— নিজের সে সুখ তার কাছে ধরা পড়ে না। বরং অন্যের সুখটাই তার চোখে বড় হয়ে ধরা পড়ে। আবার অন্যজনও তদুপ নিজের সুখ ও সম্পদকে না দেখে অন্যের সুখ ও সম্পদকে বড় করে দেখে।

নদীর দুপারে সমান সুখ-সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক পারই নিজের সুখকে ছোট করে, ওপারের সুখকে বড় করে দেখে। মানুষের বেলাতেও একথা সত্য।

**৪. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল ভুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।**

মানবজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে সুখের স্বর্গ রচনা করতে হয়। মানুষ চিরদিন সুখের অভিলাষী। সেই সুখ লাভের জন্য তাকে সাধনা করতে হয়, নানা ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে হয়। দুঃখ লাভ ছাড়া সুখ লাভ হয় না। এটাই জীবনের বৈশিষ্ট্য।

মানুষ সুন্দরের পূজারি। পদ্মফুল সুন্দর। তাই সে সকলের মনকেই রূপ ও গুণের মোহ ছড়িয়ে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাকে লাভ করা খুব কঠিন। কারণ পদ্মফুলের গাছে প্রচুর কাঁটা আছে। সেই গাছ থেকে পদ্ম ছিঁড়তে গেলে আজুলে কাঁটা ফুটে হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়। যে সেই কাঁটার আঘাত পাবে বলে ভয় পায়, সে পদ্ম ফুল সংগ্রহ করতে পারে না।

তেমনি মানবজীবনের কোনো মহৎ কর্মই ত্যাগ-তিতীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সফল হয় না। এই বিশ্বে সুখ লাভ করতে গিয়ে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। এই সুখের পথ নানা প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে ঘেরা। সুখ আর দুঃখ যেন গাড়ির চাকার মতো ঘোরে। সুখকে লাভ করতে হয় দুঃখের মধ্য দিয়ে। জীবনে যারা বাধা-বিপত্তি, নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করে নিজের বাসনায় অবিচল তারাই তাদের ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ জীবনে সুখ পেতে হলে দুঃখকে বরণ করতে হয়। জীবনের সফলতা লাভ করতে হলে আমাদের জীবনপথের সকল বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-দুর্দশা বরণ করেই অগ্রসর হতে হবে। কারণ সুখ-দুঃখ দুই ভাই। মনে রাখতে হবে দুঃখের সাধনাই সিদ্ধির সাধনা।

**৫. জন্ম হোক যথা তথা
কর্ম হোক ভালো।**

জন্মের উপর মানুষের কোনো হাত নেই। কিন্তু কর্ম সম্পূর্ণ তার নিয়ন্ত্রণে। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার গোত্রে বা বংশে নয়। যে কোনো বংশেই মানুষ জন্মগ্রহণ করুকনা কেন, সে নিজগুণে কর্মদক্ষতা ও জ্ঞানচর্চার জন্য কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি কেউ নানা রকম অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়, তবে সমাজে, কেউ তাকে ভালোবাসেনা। বরং সবাই তাকে ঘৃণা করে।

অথচ নীচ কূলে জন্মগ্রহণ করে সততা, কর্মনিষ্ঠা ও মহত্বগুণে যে কোনো ব্যক্তি সমাজে স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারে, সমাজে যশ ও প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, তারা যেকোনো বংশে বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেও কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং জ্ঞানসাধনার ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করে নিজের দুষ্কর্ম ও হীনচরিত্রের জন্য সমাজে ঘৃণিত ও অসম্মানিত হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। সমাজে গুণী, সৎ ও চরিত্রবান লোকই প্রকৃত সম্মান লাভ করে থাকেন। সুতরাং বংশ পরিচয়ই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নয়। সৎকর্ম, সৎগুণাবলি ও জ্ঞানসাধনার মাধ্যমেই নির্ণীত হয় কে উত্তম কে অধম।

৬. যতবড় হোক ইন্দ্রধনু সে সুদূর আকাশে আঁকা আমি ভালবাসি মোর ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা।

দূরের অপরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য স্বভাবতই আমাদের আকৃষ্ট করে। আমরা সেই স্বপ্নিল সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের চারদিকে খুব কাছাকাছি যে সহজসরল সৌন্দর্য রয়েছে তার মূল্যও যে বেশি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কাছের জিনিসকে যত আপন মনে করা যায়, সহজে পাওয়া যায়, দূরের জিনিসকে সেভাবে কাছে টানা যায় না। তাই দূরের স্বপ্নিল সৌন্দর্যের চেয়ে কাছের তুচ্ছ সাধারণ বস্তুও অনেক বেশি অসাধারণ।

দূরের আকাশে কখনও কখনও বিচিত্র রঙের রংধনু দেখা যায়। সেই রংধনুর সৌন্দর্য সত্যিই মানুষকে অভিভূত করে। মানুষ তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই আকর্ষণ উপভোগ্য হয় না। কারণ তা অনেক দূরের বস্তু। তার সৌন্দর্য দূর থেকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে ছোট প্রজাপতি তার বিচিত্র রঙের পাখায় ভর করে আমাদের চারপাশে উড়ে বেড়ায়, মানুষ কাছে থেকে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। প্রজাপতি ছোট হলেও তার আছে রূপবৈচিত্র্য। কাছে থেকে দেখলে তাকে অপরূপ মনে হয়। আর প্রজাপতি কাছে থাকার জন্য মানুষ তার সৌন্দর্য সহজে উপভোগ করতে পারে। তাই দূরের রংধনুর সৌন্দর্যের চেয়ে প্রজাপতির মতো ছোট প্রাণীর সৌন্দর্য বেশি আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়। সুদূরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নাগালের মধ্যে বিরাজমান সৌন্দর্যে মানুষ অধিক মোহিত হয়।

৭. বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাড়ুকোড়ে।

এই পৃথিবীর প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব আবাসস্থান আছে। সেই নির্দিষ্ট আবাসস্থলে তাকে যথার্থ মানায়, সেখানে তার স্বাভাবিক এবং প্রকৃত সৌন্দর্য বিকশিত হয়। প্রকৃতির নিয়মে যা স্বাভাবিক তাই সুন্দর। তাই বনে যারা বাস করে তাদের বনেই বেশি সুন্দর দেখায়। সেখানে তাদের জীবন থাকে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তাদের যদি বন থেকে নিয়ে এসে অন্যত্র অনেক যত্নে ও আদরে রাখা হয় তা হলে তাদের সেই স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। তারা নিরানন্দ হয়ে পড়ে। তাদের আনন্দ থাকে না বলে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়।

তেমনি শিশুদের মায়ের কোলে যেমন সুন্দর দেখায়, অন্য কোথাও তেমনটি দেখায় না। তাছাড়া নিরাপত্তার দিক থেকেও মায়ের কোলই শিশুর উপযুক্ত স্থান। তেমনি বন্যদের জন্য বনই স্বাভাবিক স্থান। এজন্য কখনও অস্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে কাউকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। তাতে শুধু তার সৌন্দর্যই নষ্ট হয়না, তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রাণীটি বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। তাই যার যেখানে থাকার কথা তাকে সেখানে রাখাই ভালো এবং তাতেই তার মঙ্গল ও কল্যাণ।

৮. প্রকৃত বীর একবারই মরে কিন্তু কাপুরুষেরা মরে বারবার।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই একদিন মরতে হবে। মানুষ মরণশীল। অথচ এ সহজ সত্য ও স্বাভাবিক কথাটি আমরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারি না। সে কারণেই মৃত্যুকে আমরা সব সময় ভয়ের চোখে দেখি। আর এই মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তিরা পৃথিবীতে কোনো ভালো কাজ করতে পারে না। সমাজ ও পৃথিবীকে ভালো কিছু দেওয়ার মনোবল তারা হারিয়ে ফেলে।

অথচ মৃত্যু কথাটি অর্থাৎ এই চিরন্তন সত্য কথাটিকে যারা মেনে নিতে পেরেছেন, তারা কোনো কিছুতেই কোনো সময় ভয় পান না। বরং তারা মৃত্যুকে বাজি রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলেন। তারাই এই পৃথিবীকে, সমাজকে এমনকি মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। এসব বীর ও মহৎ ব্যক্তিরা একবারই মারা যান। অবশ্য তাদের সে মৃত্যু, মৃত্যু নয়। বরং তারা পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেন।

আর যারা কাপুরুষ তারা মৃত্যু আসার অনেক আগেই যে কোনো কারণে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। সামান্য বিপদেই তারা দিশেহারা ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রতিনিয়তই তারা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। এজন্যই বলা হয়েছে, প্রকৃত বীর একবারই মরে কিন্তু কাপুরুষেরা মরে বার বার।

৯. প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়

কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

প্রাণ বা আত্মা থাকলেই মানুষকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। মানুষনামের যোগ্য হতে হলে তাকে হতে হবে প্রশস্ত ও উদার মনের অধিকারী। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জীবন যাদের আছে তারা জীব বা প্রাণী। প্রাণের দিক থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য এইটুকু যে মানুষ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। আর এজন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বিবেচনা করতে পারে এবং মহৎ গুণাবলি অর্জন করে যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে। এ বিবেক-বুদ্ধিই মানুষকে সঠিক যোগ্যতা ও যথার্থ মর্যাদার অধিকারী করে। তাই, শুধু প্রাণ নয়, বিবেকবুদ্ধি বা মনই মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিচিত করে। এই অনুভূতির দ্বারাই সৃষ্টি হচ্ছে জগতের জন্য মঙ্গলজনক নানা ধরনের কাব্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান। এখনও মনুষ্যত্ব আছে বলেই মানুষ একে অন্যের দুঃখে এগিয়ে আসে। নানাভাবে সাহায্য ও সাঙ্গুনা দেয়। শোকে বেদনায় পাশে এসে দাঁড়ায়।

ইতর প্রাণীর প্রাণ আছে কিন্তু মন নেই। বিবেকবুদ্ধি নেই। তাই সে আত্মকেন্দ্রিক। সে অন্যের তেমন কোনো উপকার করে না, সেবা করতে উৎসাহী হয় না। মানুষের মন আছে বলেই সে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছে। তার মনের বিচিত্র ক্রিয়ায় জগৎ আনন্দময় হয়ে উঠেছে।

মনই মানুষকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে রূপায়িত করে। তাই মানুষ হতে হলে তাকে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ মনের অধিকারী হতে হবে।

১০. আপনি আচরি ধর্ম শিখাও অপরে।

কোনো উপদেশ অন্যকে দেওয়ার আগে নিজেকে তা পালন করতে হবে। উপদেশ দেওয়া আর উপদেশ পালন করা এক কথা নয়। উপদেশ দেওয়া যত সহজ উপদেশ পালন তত সহজ নয়। কারণ উপদেশ দাতাকে আগে উপদেশটি পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়; তা না হলে অন্যে তার উপদেশ পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করবে না।

যিনি উপদেশ দানে যোগ্য নেতা হবেন তাকে সকলের আগে অবশ্যই নেতৃত্ব দেওয়ার মতো গুণাবলি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি, তারা তাদের চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (সা) একটি শিশুকে মিষ্টি না খাওয়ার উপদেশ দেওয়ার জন্য পনের দিন চেষ্টা করে তিনি মিষ্টি খাওয়া ত্যাগ করেছিলেন— এ কথা কে না জানে।

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিব্রাজক ও বিদেশি পণ্ডিতগণ মন্তব্য করেছেন— বাংলাদেশের মাটিতে সোনা ফলে। অথচ বাংলা দেশের মানুষেরা নিজ দেশে পরিশ্রম না করে বিদেশে শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জনের জন্য হয়রানির শিকার হচ্ছে। অথচ এরাই নিজ দেশে পরিশ্রম করে সমৃদ্ধি লাভ করার জন্য অপকে উপদেশ দিচ্ছে।

আমরা সবাইকে ভালো হবার উপদেশ দিই, অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেরা ভালো নই। সুতরাং, আমাদের সকলেরই উচিত অন্যকে ভালো মানুষ হওয়ার উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেরা ভালো মানুষে পরিণত হওয়া। নিজের জীবনে মহৎ গুণাবলি অর্জন করতে পারলেই অন্যকে মহৎ হওয়ার উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। আমাদেরও উচিত অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেকে সে বিষয়ে যোগ্য করে তোলা। যে বিষয় নিজে পালন করব না তার সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার অধিকার কারও নেই।

১১. সজা দোষে লোহা ভাসে।

কুসংসর্গে মানুষ অমানুষ হয়। তার সদগুণগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে সে হয় পশুর মতো অধম। মানুষ গুণগতভাবেই সত্যের পূজারি। সুন্দরের অনুসারী। তার অসৎ পথে যাওয়ার মূলে থাকে অসৎসজা।

সংসর্গের প্রভাব সর্বজনবিদিত। ভালোর সজো থেকে মানুষ ভালো হয়। তার মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। আর মন্দের সংস্পর্শে এসে মানুষ মন্দ হয়। সে তার জীবনকে খারাপ পথে পরিচালিত করে। সাধারণত লোহা পানিতে ডোবে। কারণ লোহা ওজনে ভারী। কিন্তু এই লোহা যদি হালকা কাঠ বা অনুরূপ পদার্থের সজো বেঁধে দেওয়া যায় তা হলে ডুববে না, ভেসে থাকবে।

মানুষের মধ্যেও এই সাহচর্যের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। সজাদোষে মানুষের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুসংস্পর্শে চললে মানুষের স্বভাব খারাপ না হয়ে পারে না। কারণ কুসংসর্গ চরিত্রহীনতার অন্যতম কারণ। সজাদোষে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায়। এ জগতে যত লোকের অধঃপতন হয়েছে অসৎ সংসর্গই তার প্রধান কারণ। মানুষ সতর্ক থাকলেও কুসংসর্গে পড়ে নিজের অজ্ঞাতে পাপের পথে পরিচালিত হয়। তাই কথায় বলে সংসজো স্বর্গবাস, অসৎসজো সর্বনাশ।’

সুতরাং কুসংসর্গ সযত্নে পরিহার করে চলা উচিত। মানবসমাজে অধিকাংশ অনাচার কুসংসর্গে জন্ম নেয়। একজনের চারিত্রিক দোষ অন্যদের ভেতর সংক্রামক রোগের মতোই বিস্তার লাভ করে। তাই বন্ধু নির্বাচনে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

১২. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লোভ মানুষের চরিত্রের অবনতি ঘটায়। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, তার বিবেকবোধ লোপ পায় এবং সে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। তাই লোভ মানুষের পরম শত্রু। মানুষের জীবনের সর্বনাশ করাই তার কাজ।

মানুষের বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সব সময় তাড়িত করে। কারণ মানুষ নিজের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকতে চায়না। তার যা আছে তা নিয়ে সে সুখী না হয়ে আরো বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। এই ইচ্ছা যদি শুভ সুন্দর হয়, কল্যাণকর হয় তবে তা ভালো। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার জন্য এই ইচ্ছা যদি অযৌক্তিক ও অশুভ হয়, তবে তাকে লোভ বলা যাবে।

মানুষের এই লোভ তার মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। লোভ মানুষের স্বভাবের শত্রু। কারণ অনায়াসে এই লোভ মানুষের চরিত্রহীন করতে পারে, মানুষকে সৎপথ থেকে অসৎ পথে নিয়ে যেতে পারে, তাকে বিবেকহীন করে তুলতে পারে।

কিন্তু বিবেকবান মানুষ জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র রাখার জন্য লোভ জয় করে এবং নিজেকে লোভ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর যে মানুষ লোভ নামক এই শত্রুকে জয় করতে পারে না, লোভ তাকে চপে ধরে এবং তাকে অন্যায় ও অসৎ পথে চলতে বাধ্য করে। ফলে লোভী মানুষ নানা অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে সে বিপদাপন্ন হয় এবং তার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। লোভ মানুষকে এমনই অবস্থায় নিয়ে যায় যে তার বিবেক লোপ পায়। তার ভালো-মন্দ ও পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা থাকে না। লোভী মানুষের নিজের কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলে পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করতে পারেনা। লোভের কারণে মানুষ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যায় এবং ধ্বংস ও মৃত্যুকে ডেকে আনে। লোভের কারণেই তার জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। লোভ মানুষের সকল অপরাধের উৎস। তাই সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য লোভ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

১৩. দশে মিলে করি কাজ

হারি জিতি নাহি লাজ।

মানুষ সামাজিক জীব। তাই সে একা থাকতে পারে না। সমাজ জীবনে মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচতে হলে অনেক কাজই করতে হয়। নিজে নিজে সে অনেক কাজ করতে পারলেও এমন অনেক ভারী ও বিস্তৃত পরিসরের কাজ আছে যা একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দশ জনে মিলে সে কাজ সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কথায় বলে ‘দশের লাঠি একের বোঝা’।

আমরা দেখছি পৃথিবীতে যে কোনো বড় কাজের পেছনে বহু লোকের সমবেত অবদান রয়েছে। শাহজাহানের স্বপ্নিল কল্পনার তাজমহল কোনোদিন গড়ে উঠত না, যদি না সহস্র মানুষের শ্রম সেখানে না দেওয়া যেত।

আজ মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে। এই চাঁদে পৌঁছানোর পেছনে রয়েছে বহু মানুষের স্বপ্ন, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সাধনা। সে সাধনার প্রথম পর্যায়ে কত না বাধা এসেছে। কতবার তাকে পরাজিত ও ব্যর্থ হতে হয়েছে। তবু মানুষ তার প্রচেষ্টা ছাড়েনি বলে জয়ী হতে পেরেছে।

সবাই মিলে কাজ করলে জয় বা পরাজয় যা-ই হোক না কেন, সেখানে কোনো অমর্যাদা থাকে না। মিলে-মিশে কাজ করলে জয়ে যেমন আত্মপ্রসাদ থাকে, পরাজিত হলেও মনে কোনো ক্ষোভ বা দুঃখের কারণ থাকে না। কোনো কোনো একক ব্যক্তির কর্মযজ্ঞ স্রবণীয় হয়ে আছে। কিন্তু পৃথিবীর অগ্রগতির মূলে আছে বহু মানুষের ঐক্যবন্ধ প্রচেষ্টা। কৃষিজমি থেকে ভূ-উপগ্রহ- সর্বত্রই চোখে পড়ে বহু মানুষের ঐক্যবন্ধ কর্মকোলাহল। সেই সমবেত প্রচেষ্টায় পরাজয়ও মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। সভ্যতার চাকা সচল রাখতে এর কোনো বিকল্প নেই।

১৪. পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

প্রাকৃতিক নিয়মেই বাগান আলো করে ফুল ফোটে। ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ তার নিজের জন্য নয়। ফুল ফোটে অন্যের জন্য। এই অন্যকে আনন্দ দান করাতেই তার ফুটে ওঠার সার্থকতা। ফুলের এই সৌন্দর্য উপভোগ করে যেমন ভ্রমর, মৌমাছি, প্রজাপতি, তেমনি সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষের মনও ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। তার সৌরভে মানুষের মন উদ্বেলিত হয়। মৌমাছি তার মধু পান করে পরিতৃপ্ত হয়। ফুলের পরাগের রেণু গায়ে মেখে ভ্রমর ফুলের বংশ বিস্তারে সহায়তা করে।

ফুল আবার কালক্রমে পরিণত হয় ফলে। সেই ফল আবাদন করে পরিতৃপ্ত হয় মানুষ। ক্ষুধা নিবৃত্তি করে বনের পাখিরা। তাই ফুল কখনও নিজের জন্য ফোটে না।

এই পৃথিবীতে মানুষের জন্মও শুধু নিজের জন্য নয়। কেবল আত্মস্বার্থ পরিপোষণের জন্য সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেন নি। মানবজীবনের উচ্চ লক্ষ্য আছে। মহত্তর আদর্শ আছে। সেই আদর্শ হল পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। মানুষকে ভালোবাসতে হলে মানবকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে হলে হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থবুন্ধি পরিহার করতে হবে। হৃদয়কে ফুলের মতো বিকশিত করতে হবে। এভাবে পরের জন্য, বিশ্বজনের কল্যাণের জন্য নিজের হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত করতে পারলেই মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

১৫. স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করাই কঠিন।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এই স্বাধীনতা ছাড়া মানুষ নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, এই স্বাধীনতা হারিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে। এই স্বাধীনতা হারিয়ে মানুষকে অনেক সময় পরাধীনতার শিকল পরতে হয়। এই হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ, দিতে হয় অনেক জীবন বিসর্জন। কিন্তু এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা আরো কঠিন কাজ।

স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বহু ত্যাগতিতিক্ষা ও স্বার্থহানি স্বীকার করতে হয়। যে জাতি সমষ্টিগতভাবে নিজেদের ভালোমন্দ চিন্তা করে না, যারা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের চেষ্টা করে, তারা কোনোদিনও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। তাদের স্বাধীনতা হয় ক্ষণস্থায়ী।

অথচ যে জাতি শুধু ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সমষ্টিগতভাবে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন, যারা জীবন উৎসর্গ করে দেশ ও জাতির জন্য, তাদের স্বাধীনতাই চিরস্থায়ী হয়। তারাই স্বাধীনতার যথার্থ ফল ভোগ করতে পারে।

স্বাধীনতা অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যথার্থ অর্থে একটি স্বাধীন জাতিকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থ ও উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করে জাতিকে স্বাধীনতা রক্ষার্থে একতাবন্ধ হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিক যদি আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে জাতির স্বার্থকে প্রধান বলে বিবেচনা করে, তাহলে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয় না।

১৬. নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্যের প্রসূতি।

মানবসন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায় না। মানুষকে যথার্থ মানুষ হতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর এই জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষার স্থান মানবজীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের উন্নতির কোনো বিকল্প উপায় নেই। যে ব্যক্তি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তার মনুষ্যজীবন ব্যর্থ। তাকে চরম দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হয়।

নিরক্ষরতা সব দেশেই ব্যক্তি ও জাতির জীবনে অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষাগ্রহণ না করলে মানুষ যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমেই মানবজীবন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। মানুষ বিবেকবান ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। শিক্ষাই মানুষকে মানুষের প্রতি ভালোবাসতে শিখায়।

জন্মের পর থেকেই শিক্ষা শুরু হয়। এই শিক্ষাই মানুষকে ধীরে ধীরে যোগ্যতার অধিকারী করে তোলে। পৃথিবীতে যে সব জাতি শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রগতি লাভ করেছে, তারাই বিশ্বে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারাই জাতি হিসেবে মর্যাদাবান হয়ে উঠেছে। তাই বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

অথচ ব্যক্তিজীবনে যারা শিক্ষা থেকে দূরে, তারা উন্নত জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে না। চোখ থাকতেও তারা অন্ধের মতো বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবনযাপন করে। আধুনিক বিশ্বে অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তি প্রায় অচল। উন্নত জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় থাকে না, উন্নত জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণাও সে করতে পারে না। উন্নত পেশা লাভেও সে বঞ্চিত থাকে। দারিদ্র্যই তাদের জীবনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ সে জানে না। এই ধরনের মানুষ শুধু ধুঁকে ধুঁকে মরে। নিরক্ষরতার অভিশাপ বয়ে বেড়ানোই এদের একমাত্র নিয়তি।

শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়, জাতীয় জীবনেও নিরক্ষরতা দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে। জাতি যদি নিরক্ষর হয় তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং নানা সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয় জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। নিরক্ষর জাতি আধুনিক উন্নত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। তাই বর্তমানে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সারা বিশ্বে সবার জন্য শিক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশেও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত গদ্যাংশ বা পদ্যাংশগুলোর ভাবসম্প্রসারণ কর।

১. দেশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
২. ক্ষুদ্র বালুকার কণা বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।
৩. দেশের লাঠি একের বোঝা।
৪. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো এক ফোটা দিলাম শিশির।
৫. স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানুষ তারে, পশু সেইজন।
৬. সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।
৭. বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পজু।
৮. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।
৯. শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।
১০. যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।